তাওহীদের ডাক

৫০ তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২১
Web : www.tawheederdak.com

পরহেযগারিতা
মুসলিম জীবনে হিজরী সনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
সমকালীন মনীষী : মুহাম্মাদ সাঈদ রাসলান
সাক্ষাৎকার : মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান
সন্তানদের প্রতি উম্মে হাকীমাহ্‌র উপদেশ

আল-'আওন

(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)

মাদক মুক্ত রক্তদান, সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজি নং : রাজ ৫০৯১

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২ আয়াত)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও রক্তদানে উৎসাহিত করা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাম্প্রতিক কিছু প্রকাশনা

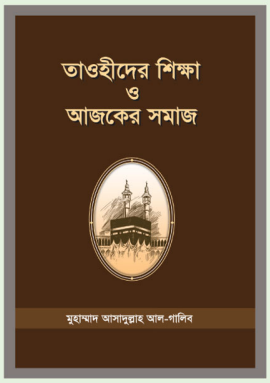

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৫০ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় : চোখের হেফাযত ২
- কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা : ক্রোধ ৩

আক্বীদা
- রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা ৫
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাবলীগ
- পরহেযগারিতা (২য় কিস্তি) ৮
  মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান

তারবিয়াত
- মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা (৯ম কিস্তি) ১৩
  আব্দুর রহীম

তাজদীদে মিল্লাত
- নারীর মূল কর্মক্ষেত্র ১৭
  এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ

সাময়িক প্রসঙ্গ
- ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও তার অসারতা ১৯
  ইউভাল নোয়া হারারী

সাক্ষাৎকার
- মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান ২২

মনীষীদের লেখনী থেকে
- আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ২৮
  মাওলানা রাগেব আহসান

শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (রহ.)-এর কুরআনী খেদমত (শেষ কিস্তি) ৩২
  ড. মুখতারুল ইসলাম

ধর্ম ও সমাজ
- নারীর তিনটি ভূমিকা (৩য় কিস্তি) ৩৭
  লিলবর আল-বারাদী

চিন্তাধারা
- সন্তানদের প্রতি উম্মে হাকীমাহ্র উপদেশমালা ৪১
  অনুবাদ : ড. মুখতারুল ইসলাম

সমকালীন মনীষী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ রাসলান ৪৩
  আব্দুল হাকীম
- পরশ পাথর ৪৫

ইতিহাস-ঐতিহ্য
- মুসলিম জীবনে হিজরী সনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৪৬
  যহুরুল ইসলাম
- অনুবাদ গল্প ৪৯
- জীবনের বাঁকে বাঁকে ৫০
- সংগঠন সংবাদ ৫৩
- সাধারণ জ্ঞান ৫৫

সম্পাদকীয়

চোখের হেফাযত

আধুনিক যুগে ফেৎনার যে জোয়ার প্রবাহিত হচ্ছে তার মধ্যে মুসলিম যুবকদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেৎনা হ'ল সাংস্কৃতিক ফেৎনা। হাযারো মিডিয়ায় বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে যৌনতা ও নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে অশ্লীল ও তথাকথিত শিল্পিত রূপ দিয়ে যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর সাথে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া যুক্ত হয়ে পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর উঠেছে। ফেসবুক বা ইউটিউবের মত আপাত নিরীহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রবেশ করলেও যেকোন মুহূর্তে অন্যায়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার ভুরি ভুরি হাতছানি তরুণদেরকে সহজেই বিভ্রান্ত করে দেয়। কোন অনৈতিক পরামর্শ তাকে অতি সহজেই প্রতারিত করে ফেলে। আর নিয়মিত এই প্রতারণার শিকার হ'তে থাকলে নৈতিকতার দৃঢ় বাঁধনগুলো একসময় আলগা হ'তে থাকে। কলুষতা আর পঙ্কিলতায় মিইয়ে যেতে থাকে অন্তরের পবিত্র আভা। অবশেষে একসময় সে হারিয়ে যায় অধঃপতনের করাল গ্রাসে।

প্রিয় পাঠক, চোখ হ'ল মানুষকে দেয়া আল্লাহ এক গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। এক মহাসম্পদ। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না এবং তোমাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয়সমূহ দিয়েছে যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(নাহল ৭৮)*। তাই এই নে'মতের অপব্যবহার করলে একদিন আল্লাহর কাছে কঠোর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, 'কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়- প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। সুতরাং চোখের হেফাযত করা বিশেষত বর্তমান যুগের তরুণ সমাজের জন্য অতীব যরূরী। কেননা হাল যামানায় সংঘটিত প্রায় সকল সামাজিক পাপের জন্য মূলত চোখই দায়ী। চোখের পাপ থেকে বাঁচা এবং চোখের হেফাযতের জন্য আমরা নিম্নোক্ত কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি-

(১) দৃষ্টি সংযত রাখা : দৃষ্টি হ'ল শয়তানের বিষাক্ত তীরের মত, যা দিয়ে শয়তান খুব সহজেই মানুষকে পাপের ফাঁদে আটকাতে পারে। এজন্য আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ!) বিশ্বাসীদের বল, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং যৌনাঙ্গকে হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত *(আন-নূর ৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চোখের যেনা হল দৃষ্টিপাত করা, জিহ্বার যেনা হল কথা বলা এবং অন্তরের যেনা হল কুপ্রবৃত্তি ও কুকামনার বশবর্তী হওয়া। আর যৌনাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করে *(বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭)*। সুতরাং রাস্তাঘাটে চলাফেরা, পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ায় পদচারণা, ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা সর্বক্ষেত্রে দৃষ্টি সংযত রাখার এই নীতি কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে।

(২) একাকী নির্জনে না থাকা : একাকিত্ব ও কর্মহীনতা মানুষকে সহজেই পাপের পথে ধাবিত করে। মানুষের অধিকাংশ পাপ একাকিত্বের সময়ই সংঘটিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি লোকেরা একাকিত্বের মাঝে কি ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি; তবে কোন আরোহী রাতে একাকী সফর করত না' *(বুখারী হা/২৮৯৮)*।

বর্তমান ফেৎনার যুগে গোপন পাপ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি ভয়ংকর হুশিয়ারী বার্তা আমাদের মনে রাখা অতীব যরূরী। তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। রাবী ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ের। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে সুযোগ পেলে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হয় *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র থেকে গোপন করে না; অথচ তিনি তাদের সংগেই রয়েছেন, যখন তারা রাতে আল্লাহর অপসন্দনীয় কোন কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সবই আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত' *(নিসা ১০৮)*।

(৩) শয়তানের প্রতারণা থেকে সদা সতর্ক থাকা : তরুণ সমাজকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় ও প্রকাশ্য শত্রু। তাই নিজেকে কখনোই শয়তানের ফিতনা থেকে নিরাপদ ভাবা যাবে না। সেই সাথে নিজের ভেতরকার প্রচণ্ড নৈতিকতাবোধকে সদা জাগ্রত ও সুদৃঢ় রাখতে হবে, যেন কোন অসতর্ক মুহূর্তেও শয়তান কোনভাবে প্রতারিত করতে না পারে। শয়তানের করাঘাত অনুভূত হওয়া মাত্রই শয়তানকে পরাজিত করার তীব্র স্পৃহা যেন সজাগ হয়ে উঠে। শয়তানকে মোটেই প্রশ্রয় না দিয়ে এভাবে নিজের মনকে প্রস্তুত করাটা খুবই যরূরী। যদি তা করা সম্ভব হয়, তবে একসময় অবচেতনভাবে নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি ও বিবেকের বন্ধন প্রবল হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিজের মধ্যে প্রতিরোধবর্ম তৈরী হবে।

আর যদি শয়তানকে প্রশ্রয় দেয়া হয় এবং পাপ করাটা একবার সহজ হয়ে যায়, তাহলে প্রবৃত্তির কাছে সে নিয়মিতই পরাজিত হতে থাকবে, যেখান থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য হয়ে উঠবে কঠিন থেকে কঠিনতর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, চাটাই বুনন বা ছিলকার মত এক এক করে ফেৎনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকবে।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ক্রোধ

আল-কুরআনুল কারীম :

১- اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ-

(১) ‘যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

২- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ- وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

(২) ‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান। যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৬)*।

৩- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا-

(৩) ‘রহমান’ (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন মূর্খ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম’ *(আল-ফুরক্বান ২৫/৬৩)*।

৪- وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ-

(৪) ‘আর যারা কবীরা গোনাহ সমূহ ও নির্লজ্জ কর্মসমূহ হ’তে বিরত থাকে এবং যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে’ *(আম্বিয়া ৪২/৩৭)*।

৫- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

(৫) ‘আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ’তে তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে-ইমরান ৩/১৫৯)*।

হাদীছে নববী :

٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম’।[১]

٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِى قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ-

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বললো, আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটা কয়েকবার তা বললেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক বারই বললেন, রাগ করো না’।[২]

٨- عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّى لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

(৮) সুলায়মান ইবনু সুরাদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু’জন লোক নবী (ছাঃ)-এর সামনে একে অন্যকে গালি দিচ্ছিল। আমরাও তাঁর কাছেই উপবিষ্ট ছিলাম, তাদের

১. *বুখারী হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১০৫।*
২. *বুখারী হা/ ৬১১৬;মিশকাত হা/৫১০৪।*

একজন এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার চেহারা ফুলে বিগড়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই একটি কালিমা জানি। যদি সে ঐ কালিমাটি অর্থাৎ 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম' পড়তো, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী করীম (ছাঃ) কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না? সে বলল, আমি নিশ্চয়ই পাগল নয়'।[৩]

৯- ...كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِىَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ-

(৯) হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু বকর (রাঃ) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- সে সময় তিনি সিজিস্থানে অবস্থানরত ছিলেন যে, তুমি রাগের অবস্থায় বিবাদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়ছালা করো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না'।[৪]

১০- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ-

(১১) ইবনে উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই'।[৫]

১১- عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ-

(১১) আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেন, যদি তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল; নয়তো সে শুয়ে পড়বে'।[৬]

১২- عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ-

(১২) সাহল ইবন মুআয (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধকে সম্বরণ করে, অথচ সে কাজ করতে সে সক্ষম; (তার এ ছবরের কারণে) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকলের সামনে ডেকে বলবেন, তুমি যে হুরকে চাও, পসন্দ করে নিয়ে যাও'।[৭]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ওমর ইবনু আব্দুল আযীয বলেন, সফলকাম তো সেই ব্যক্তি যে নিজের মনোস্কামনা, আশা এবং ক্রোধ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।[৮]

২. আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান বলেন, ক্রোধের সময়ে ব্যক্তির সহনশীলতা বুঝা যায়। প্রকৃত সহনশীল ব্যক্তি সেই যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।[৯]

৩. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, প্রকৃত শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর ক্রোধ যদি তার উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে সে শক্তিশালী বা বীর কোনটিই নয়।[১০]

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ক্রোধ হলো জ্ঞানের জন্য ছলনাময়ী ভূতের মত, যা ব্যক্তিকে তার শিকারে পরিণত করে যেমনভাবে একটি নেকড়ে দলছুট ছাগীকে শিকারে পরিণত করে। আর শয়তানের সবচেয়ে বড় শিকার হল প্রবৃত্তি পূজারী এবং ক্রোধান্বিত ব্যক্তি'[১১]।

৫. ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, কথায় সচ্চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটাও এবং ক্রোধকে সর্বত্রভাবে বিদায় জানাও'।[১২]

সারবস্তু :

১. বান্দার ক্রোধ মহান পরম করুণাময় মহা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এবং অভিশপ্ত শয়তানকে সন্তুষ্ট করে।

২. শত্রুর মোকাবেলায় ক্রোধ নয়। বরং ধৈর্যই বেশী কাজে দেয়।

৩. ক্রোধ মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং জীবনের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে।

৪. ক্রোধ জান্নাত পাগল মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা ক্রোধান্বিত ব্যক্তি শয়তানের অনুগামী হয়।

৫. যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে ঈমান ও শান্তি দ্বারা পূর্ণ করবেন এবং জান্নাতী মেহমান হিসাবে অভ্যর্থনা জানাবেন।

---

৩. বুখারী হা/৬১১৫; মুসলিম হা/২৬১০।
৪. বুখারী হা/৭১৫৮; মুসলিম হা/১৭১৭।
৫. ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৯।
৬. আবুদাউদ হা/৪৭৮২।
৭. আবুদাউদ হা/৪৭৭৭।
৮. শারহু ছহীহুল বুখারী লি ইবনি বাত্তাল ১/৩৬৮ পৃ.।
৯. রাওযাতুল উক্বালা লি ইবনে হিব্বান বাসতী ১৪১ পৃ.।
১০. ইস্তেক্বামাহ ২/২৭১ পৃ.।
১১. আত-তিবইয়ানু ফী আক্বসামিল কুরআন ২৬৫ পৃ.।
১২. জামেউল উলূম ওয়াল হাকাম লি ইবনে রজব ১/৩৬৩ পৃ.।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা : ভালোবাসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিশেষ নে'মত। এই নে'মতের একটি বিশেষ অংশ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য রাখা ঈমানেরই অংশ। আর এই ভালোবাসার অংশটি হ'তে হবে নিজের জীবন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজনসহ দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশী। এতেই রয়েছে ইহলৌকিক শান্তি ও পরলৌকিক মুক্তি। মীলাদুন্নবী, শবে মেরাজ, শবে বরাতের মত অতিরঞ্জিত বিদ'আতী ভালবাসা রাসূলের শানে কাম্য নয়। প্রকৃত রাসূল প্রেমিক হওয়া তাঁর আনুগত্যে, ঈদ-উল্লাসের মধ্যে নয়। প্রকৃতার্থে এমনটি হ'ল তাঁর বিরুদ্ধাচারণ, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বরং একজন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসবে। নিম্নে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল।

নিজের জীবনের চেয়ে বেশী রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসা :

হাদীছে এসেছে, عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الآنَ يَا عُمَرُ- আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি যখন উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর হাত ধরেছিলেন। উমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, না। ঐ মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এমন কি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হ'তে হবে। তখন উমর (রাঃ) তাকে বললেন, এখন আল্লাহ্র কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়। নবী (ছাঃ) বললেন, হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।[১]

পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের চেয়ে বেশী ভালোবাসা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ- আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় না হব'।[২]

দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসা :

মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি বলে দাও, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, স্বগোত্র ও ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর, ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হবার আশংকা কর এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা হ'তে অধিক প্রিয় হয়। তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তাওবাহ ৯/২৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় গ্রন্থে বলেন, أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا 'এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা হতে অধিক প্রিয় হয়' অর্থাৎ তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তোমাদের কিভাবে শাস্তি প্রদান করেন এবং তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেন'।[৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ ও হাসান (রহঃ) বলেছেন, حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ 'তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত' অর্থাৎ তাদের শাস্তি অতি সন্নিকটে'।[৪] আল্লামা যামাখশারী বলেন, এই আয়াতটি কঠিন শাস্তির কথা বর্ণনা করে'।[৫]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই আয়াত দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসা ওয়াজিব। এর ব্যতিরেকে কোন উপায় নেই। আর যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা অগ্রাধিকার পাবে'।[৬]

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসার ফলাফল :

(১) আল্লাহ্র ভালোবাসা ও ক্ষমা :

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তুমি

১. *বুখারী হা/৬৬৩২।*

২. *মুসলিম হা/৬৯ (৪৪)।*
৩. *ইবনু কাছীর ২/৩২৪।*
৪. *তাফসীরে কুরতুবী ৮/৯৫-৯৬ পৃঃ।*
৫. *তাফসীরে কাশশাফ ২/১৮১।*
৬. *তাফসীরে কুরতুবী ৮/৯৫; আইসারুত তাফাসীর ২/১৭৭।*

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

(২) ঈমানের স্বাদ আস্বাদন :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ– আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা। ৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অপছন্দ করে'।[৭]

অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দুশমনী করবে; আর দান করবে আল্লাহ্র জন্য এবং দান করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, সে ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে'।[৮]

(৩) পরকালে রাসূলের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم– আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি একদিন বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এক ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের অনুরূপ আমল করে না। তখন তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি তাদের সাথী হবে, যাদেরকে তুমি ভালোবাসো। তখন আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি তো আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি তার সাথী হবে, যাকে তুমি ভালোবাসো। রাবী বলেন, আবু যার (রাঃ) পুনরায় এরূপ বললে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একইরূপ জবাব দেন'।[৯] অপর হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, তুমি সেদিনের জন্য কী পাথেয় সঞ্চয় করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার সঙ্গে উঠবে যাকে তুমি ভালোবাসো।

আনাস (রাঃ) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পরে আমরা এত বেশী খুশী হইনি যতটা নবী করীম (ছাঃ) -এর বাণী, فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ 'তুমি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো' দ্বারা আনন্দ লাভ করেছি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ, তার রাসূল, আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-কে ভালোবাসি। সুতরাং আমি আশা করি যে, ক্বিয়ামত দিবসে আমি তাদের সঙ্গে থাকব, যদিও আমি তাদের মত আমল করতে পারব'।[১০]

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসার আলামত :

রাসূলকে স্বপ্নে দেখার আকাঙ্খা রাখা :

আর এটা তার পক্ষেই সম্ভব হবে যে প্রকৃত অর্থে রাসূলকে ভালোবাসে। তাঁর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ ও সালাম প্রেরণ করা। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর সান্নিধ্য লাভের কামনা করা। তাঁকে দেখার সৌভাগ্য অর্জনের অপেক্ষায় থাকা। এই ধরাধমে কারো মধ্যে রাসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটলে আনন্দিত হওয়া ও রাসূলের অপমানে হৃদয় ব্যথিত ও ব্যাকুল হওয়া। শারঈ সমস্ত আমলের পাবন্দী হওয়া। এতেই তো তাঁকে স্বপ্নে দেখার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

রাসূলের ভালোবাসায় কাঁদা :

বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِى بَيْتِ أَبِى بَكْرٍ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِى بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَقَنِّعًا فِى سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَاءٌ لَهُ أَبِى وَأُمِّى وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِى هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّى قَدْ أُذِنَ لِى فِى الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ–

৭. *বুখারী হা/১৬,২১,৬০৪১।*
৮. আবু দাঊদ হা/৪৬৮১।
৯. আবু দাঊদ হা/৫১২৬।
১০. *মুসলিম হা/২৬৩৯।*

একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবু বকর (রাঃ) এর ঘরে বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবু বকরকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা ঢাকা অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবু বকর (রাঃ) তাঁর আগমন বার্তা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান। আল্লাহ্র কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণেই আসছেন। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) পৌঁছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হ'ল। প্রবেশ করে নবী (ছাঃ) আবু বকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান! এখানে তো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফরসঙ্গী হ'তে ইচ্ছুক। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঠিক আছে'।[১১]

হাফেয ইবনু হাযার আসকালানী (রহঃ) বলেন, ইবনু ইসহাক তার রেওয়ায়েতে বৃদ্ধি করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতা আবুবকরকে সেই দিন কাঁদতে দেখেছি। আর তাকে খুশিতে এর আগে বা পরে কখনও কাঁদতে দেখিনি'।[১২]

রাসূলের আগমনে আনছারদের খুশী :

যখন মদীনাবাসী রাসূল (ছাঃ)-এর কথা যখন শুনলেন তখন থেকে তাঁর আগমনে উদগ্রীব ছিলেন। সীরাত গ্রন্থ থেকে তা খুবই সহজেই অনুমেয় হয়। যখন মদীনার মুসলমানেরা শুনলেন যে রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে বের হয়ে গেছেন তখন থেকে তারা রোদ্রের দ্বিপ্রহর তাপ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। বুখারীতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, মদীনায় মুসলমানগণ শুনলেন যে নবী করীম (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রত্যহ সকালে মদীনার (বাইরে) হার্রা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করে থাকতেন, দুপুরে রোদ প্রখর হলে তাঁরা ঘরে ফিরে আসতেন। একদিন তাঁরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় একজন ইয়াহুদী তার নিজ প্রয়োজনে একটি টিলায় আরোহন করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইয়াহুদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি- যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলমানগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে এবং মীনার হার্রার উপকণ্ঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সকলকে নিয়ে তিনি ডান দিকে মোড় নিয়ে বনী আমর ইবনু আউফ গোত্রে অবতরন করলেন'।[১৩]

ইবনু সাঈদের বর্ণনায় এসেছে, সূর্যের তাপের প্রখরতা বৃদ্ধি হলে মদীনাবাসীরা তাদের বাড়ীতে ফিরে আসত'।[১৪]

মুসতাদরাক হাকেমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তারা রাসূলের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করত, যতক্ষণ দ্বিপ্রহরের উত্তাপ তাদের জন্য অত্যাধিক কষ্টকর মনে হত'।[১৫]

অপর এক বর্ণনায় রাসূলের আগমনের পূর্বে মদীনার অবস্থা কেমন ছিল তা বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনার হার্রায় একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনছারদের সংবাদ দিলেন। তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এলেন এবং উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ এবং মান্যবর হিসাবে আরোহণ করুন। নবী করীম (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) উটে আরোহণ করলেন আর আনছারগণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের বেষ্টন করে চলতে লাগলেন। মদীনায় লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহ্র নবী এসেছেন, আল্লাহ্র নবী এসেছেন, লোকজন উঁচু যায়গায় উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল আল্লাহ্র নবী এসেছেন। তিনি সামনের দিকে চলতে লাগলেন। অবশেষে আবু আইয়ুব (রাঃ)-এর বাড়ীর পাশে গিয়ে অবতরণ করলেন'।[১৬]

সেই দিন রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রায় ৫০০ আনছারী এসেছিলেন'।[১৭] রাসূলের হাবীব আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি ও আল্লাহ্র রাসূল যখন মদীনায় আসলাম তখন আনছারীরা আমাদের সাক্ষাতে রাস্তায় বের হয়ে আসল। বৃদ্ধ ও বাচ্চারা সেই দিন বলছিল, اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ مُحَمَّدٌ 'আল্লাহু আকবার আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এসেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছেন'।[১৮]

উপসংহার : রাসূল প্রেম মুমিন জীবনে একটি আবশ্যিক বিষয়। কথায় নয়, কাজে তার প্রমাণ দিতে পারলেই, তবেই মুমিনের কাঙ্খিত জান্নাত। অন্যথায় নয়। কোন বিদআতী তরীকায় মুহাব্বাত প্রকাশ করা প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেম নয়, বরং তাকে অপমান করার শামিল। সুতরাং আমাদেরকে সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা রাখতে হবে এবং তাঁর আদর্শকে সর্বদা অনুসরণ করে চলতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

১১. *বুখারী হা/৩৯০৫।*
১২. *ফৎহুল বারী ৭/২৩৫ পৃঃ ইবনু হিশাম ২/৯৩।*
১৩. *বুখারী হা/৩৯০৬।*
১৪. *তবকাতুল কুবরা ১/২৩৩।*
১৫. *মুসতাদরাক হাকেম হা/৪২৭৭।*
১৬. *বুখারী হা/৩৯১১।*
১৭. *আহমাদ হা/১৩৩৪২।*
১৮. *আহমাদ হা/৩।*

পরহেযগারিতা

- মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান

(২য় কিস্তি)

প্রকাশ্যে ও গোপনে পরহেযগারিতা অর্জন করা :

পরহেযগারিতা নামক এই মহৎ গুণটি সর্বাবস্থায় রাখতে হবে। যেমনটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার সাথীদের নিয়ে একদিন মদীনার অদূরে কোন এক প্রান্তে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বের হন। স্থানীয় লোকেরা তাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে এবং তাদের জন্য খাওয়ার দস্তরখান বিছিয়ে দেয়। তারা সকলেই খাওয়ার দস্তরখানে বসল। এমতাবস্থায় একজন ছাগলের রাখাল তাদের সালাম দিল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাখালকে বলল, হে রাখাল! তুমি আস, আমাদের সাথে খাওয়াতে শরিক হও। সে বলল, না আমি খাব না; আমি ছিয়াম রত অবস্থায় আছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) রাখালকে বলল, তুমি এ প্রচণ্ড গরমের দিনে ছিয়াম রাখছ এবং ছিয়াম অবস্থায় এ পাহাড়ের পাদদেশে ছাগল চরাচ্ছ? আব্দুল্লাহ ইবনু ওমরের কথার উত্তরে সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি সেদিনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি যেদিন আমাদের খালি হাতে একত্র হ'তে হবে। একমাত্র আমল ব্যতীত আমাদের আর কিছুই থাকবে না। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি আমাদের নিকট তোমার এ ছাগলগুলো হ'তে একটি ছাগল বিক্রি করবে? যদি বিক্রি কর, আমরা তোমাকে ছাগলের মূল্য দিব এবং যবেহ করে তোমার জন্য গোশত দিব, যাতে তুমি গোশত দিয়ে ইফতার করতে পার। তখন সে বলল, এখানে যে ছাগলগুলো দেখছেন, তার একটিও আমার ছাগল নয়, এগুলো সব আমার মনিবের। ইবনু ওমর (রাঃ) রাখালকে বললেন, যখন তুমি একটি ছাগল হারিয়ে ফেল, তখন তোমার মনিবের আর কিছুই করার থাকবে না। তুমি বলবে, একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এ কথা শুনে রাখালটি আকাশের দিকে হাত উঁচু করে এ কথা বলতে বলতে দৌড় দিল, আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ কোথায়? অতঃপর ইবনু ওমর (রাঃ) রাখালের কথাটি বলতেন এবং স্বরণ করতেন। তিনি যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন তার (রাখালের) মনিবকে ডেকে পাঠালেন এবং তার থেকে তার ছাগলগুলো এবং রাখালকে কিনে নিলেন, তারপর রাখালকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাকে ছাগলগুলো দিয়ে দিলেন'।[১]

মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারির পরিবর্তন হয়। মানুষের অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারির সংজ্ঞা ও অবস্থার পরিবর্তন হয়। একজন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, মান-মর্যাদা ও বয়স ইত্যাদি ভেদাভেদের কারণে পরহেযগারিতার ভেদাভেদ বা পার্থক্য হয়।

যারা বয়সে ছোট তাদের পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী হ'ল, বড়দের কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাদের কোন বিষয়ে তারা কোন মতামত দিবে না। আর যারা বড়, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাদের পরহেযগারিতা হ'ল, চুপ করে না থাকা। তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করবে এবং যারা দায়িত্বশীল তাদের সঠিক পরামর্শ দিবে। যাতে তারা কোন ভুল সিদ্ধান্ত জাতির উপর চাপিয়ে দিতে না পারে।

অনুরূপভাবে একজন জাহেল (মূর্খ) ও আলেমের পরহেযগারিতা এক হ'তে পারে না। আল্লামা হুবাতুল্লাহিল মুক্বরী (রহঃ) বলেন, مِنْ وَرْعِ الْعَالِمِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَمِنْ وَرْعِ الْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ 'একজন আলেমের পরহেযগারিতা হ'ল, প্রয়োজনের সময় কথা বলা। আর একজন জাহেলের (মূর্খের) পরহেযগারিতা হ'ল, চুপ থাকা'।[২]

আল্লামা ইবনু ও'আইনা (রহঃ)-কে পরহেযগারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, উত্তরে তিনি বলেন, اَلْوَرْعُ طَلَبُ الْعِلْمِ الَّذِيْ يَعْرِفُ بِهِ الْوَرْعَ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ طُوْلُ الصَّمْتِ وَقِلَّةِ الْكَلَامِ وَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِنِ الْمُتَكَلِّمُ الْعَالِمِ أَفْضَلُ عِنْدِيْ وَأَوْرَعَ مِنَ الْجَاهِلِ الصَّامِتِ 'পরহেযগারিতা হ'ল, যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা দ্বীনদারিকে জানা যায়, সে ইলমের অনুসন্ধান করা। আর তা হ'ল, কারো কারো মতে অধিক চুপ থাকা এবং কথা কম বলা। অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেন, একজন জ্ঞানী যে কথা বলে, সে আমার নিকট একজন জাহেল বা মূর্খের থেকে উত্তম যে কথা না বলে চুপ থাকে।[৩]

ইলম ও পরহেযগারিতা :

পরহেযগারিতা এটি নিঃসন্দেহে অন্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল বা মহান কর্ম। যারা পরহেযগার তাদের মর্যাদা অধিক। তবে ইলম ব্যতীত কখনোই পরহেযগারিতা অর্জন করা যায় না।

আল্লামা আবু মাসঊদ (রহঃ) বলেন, إِنَّ التَّوَرُّعَ عَنْ مَحَارِمِهِ سُبْحَانَهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اَلْمَنُوْطُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 'আল্লাহ তা'আলা যা হারাম বা নিষিদ্ধ

১. *শু'আবুল ঈমান হা/৫২৯১।*

২. *আল্লামা মুরক্বী, আন-নাসেখ ওয়াল মানসুখ ১/৩৮ পৃ.।*

৩. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২৯৯ পৃ.।*

ঘোষণা করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকাটা নির্ভর করছে হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকার উপর। কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম তা জানতে না পারলে হালাল-হারাম বেঁচে চলা সম্ভব নয়। আর হালাল-হারাম সম্পর্কে জানার একমাত্র উৎস হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ'।[৪]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, পরহেযগারিতার পূর্ণতা হ'ল, একজন মানুষ ভালোর ভালোত্বকে জানা এবং খারাপের খারাপিকে জানা। আর এ কথা অবশ্যই জানা থাকতে হবে, ইসলামী শরী'আতের ভিত্তি হ'ল, কল্যাণ লাভকে নিশ্চিত করা এবং কল্যাণকে পূর্ণতায় পৌঁছানো এবং সব ধরনের ক্ষতিকে প্রতিহত করা এবং যথাসম্ভব তা দমিয়ে রাখা। অন্যথায় যে লোক কাজ করা ও না করার মধ্যে ভালো-মন্দ তারতম্য করতে পারে না এবং কোনটির মধ্যে ইসলামী শরী'আতে কল্যাণ রেখেছে আর কোনটির মধ্যে ইসলামী শরী'আত অকল্যাণ বা ক্ষতি রেখেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে না, তার অবস্থা এমন হবে সে কোনো সময় যা করা ওয়াজিব তা ছেড়ে দিবে আর যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ তা করে বসবে। আবার কোনো সময় কোন কাজকে সে তাক্বওয়া মনে করবে কিন্তু বাস্তবে তা তাক্বওয়া নয়, বরং ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। যেমন অনেক লোকে দেখা যায় তারা যালিম বা অত্যাচারী শাসকের সাথে একত্র হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছেড়ে দেয়, তারা মনে করে এটা পরহেযগারি বা বুজুর্গি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন- কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থায় কতিপয় মুসলিম সৈন্য তাদের আমীরের বা শাসকের নিকট এসে দেখতে পেল সে কোন শরী'আত বিরোধী কাজে লিপ্ত, তখন তারা তার অবস্থা দেখে বলল, আমরা এ ফাসেক বা পাপাচারীর সাথে থেকে যুদ্ধ করতে রাযী না। এই বলে তারা যদি যুদ্ধ করা হ'তে বিরত থাকে তাহলে কি লাভ হবে? এ ধরনের ভ্রান্ত তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতার কারণে দুশমনরা এসে শহরকে দখল করে নিবে এবং মুসলিমদের বিপর্যয় নেমে আসবে! অর্থাৎ যার পরিণতি কারোর জন্যই শুভকর হবে না। পরহেযগারিতা অবলম্বন করার জন্য সময় সুযোগ বুঝতে হবে। আর এসব বুঝার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও দক্ষতা।

ইলম বা জ্ঞানহীন পরহেযগারির বা দ্বীনদারের আরেক দৃষ্টান্ত হ'ল, একজন ব্যক্তির পিতা মারা যাওয়ার পর তার কিছু সন্দেহযুক্ত সম্পদ রয়েছে; অর্থাৎ যেগুলো তার পিতা দুনিয়াতে রেখে গেছে। সাথে সাথে তার এমন কতিপয় পাওনাদার রয়েছে, যারা তার নিকট টাকা পাবে। তারপর লোকেরা যখন তার ছেলের নিকট এসে তাদের পাওনা দাবি করে, তখন সে বলে, আমি সন্দেহযুক্ত সম্পদ হ'তে আমার পিতার দেনা-পাওনা পরিশোধ করা হ'তে বিরত থাকতে চাই।

এ ধরনের পরহেযগারিতা ফাসেদ বা ভ্রান্ত এবং যারা এ ধরনের পরহেযগারিতা অবলম্বন করে তারা জাহেল বা মূর্খ। কেননা সে তার পিতার সম্পদে সন্দেহ রয়েছে এ কথা বলে মানুষের অধিকার বা পাওনা পরিশোধ করা ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ মানুষের পাওনা পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব।

জ্ঞান না থাকা মানুষকে অনেক ভালো কাজ হ'তে বঞ্চিত করে। কারণ, তারা মনে করে, এ ধরনের কাজ না করাটাই পরহেযগারিতা। অতঃপর ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَيَدَعُ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ فِيهِمْ بِدْعَةٌ أَوْ فُجُورٌ وَيَرَى ذَلِكَ مِنْ الْوَرَعِ وَيَمْتَنِعُ عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الصَّادِقِ وَأَخْذِ عِلْمِ الْعَالِمِ لِمَا فِي صَاحِبِهِ مِنْ بِدْعَةٍ خَفِيَّةٍ وَيَرَى تَرْكَ قَبُولِ سَمَاعِ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ سَمَاعُهُ مِنْ الْوَرَعِ . 'অনেক লোককে দেখা যায়, তারা যেসব ইমামদের মধ্যে কোন প্রকার বিদ'আত বা অন্যায় দেখতে পায়, তাদের পিছনে জামা'আতে ছালাত ও জুম'আর ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয়। তারা মনে করে তাদের পিছনে ছালাত আদায় করার চেয়ে একা ছালাত আদায় করা পরহেযগারিতা। কিন্তু তাদের এ ধরনের ধারণা কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুরূপভাবে যখন কোন আলেমের মধ্যে কোন গোপন বিদ'আত পরিলক্ষিত হয় বা কোন সঠিক সাক্ষ্যদাতা তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায়, তখন তাদের থেকে ইলম অর্জন করা ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হ'তে বিরত থাকে। তারা মনে করে তাদের থেকে হক কথা শুনে গ্রহণ করা ছেড়ে দেয়া হ'ল পরহেযগারিতা। অথচ হক কথা শুনেও তা গ্রহণ করা ওয়াজিব।[৫]

সালাফে ছালেহীনদের পরহেযগারিতার কতিপয় দৃষ্টান্ত :

নবী করীম (ছাঃ)-এর পরহেযগারিতা :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ইবনু আলী (রাঃ) ছাদাক্বার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তা ফেলে দেয়ার জন্য 'ওয়াক' 'ওয়াক' (বমির পূর্বে আওয়াযের মত) বললেন। অতঃপর বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা ছাদাক্বাহ ভক্ষণ করি না।[৬]

তিনি তাঁর নাতিকে যে খেজুর খাওয়া বৈধ না তা ধরতে নিষেধ করতেন। অথচ সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও ছোট ছেলে, শরী'আত মানতে বাধ্য নয়।

৪. তাফসীরে আবী সা'উদ ২/১৩০ পৃ.।

৫. মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৫১২ পৃ.।
৬. বুখারী হা/১৪৯১; মুসলিম হা/১০৬৯।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমার ঘরে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা ছাদাক্বার খেজুর হবে তাই আমি তা রেখে দেই'।[৭]

আমাদের সালাফে ছালেহীনদের মধ্যে অনেকেই পরহেযগারিতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কখনোই নিজেদের পরহেযগার হিসাবে দাবি করতেন না, বরং তারা তাদের থেকে এ ধরনের কোন গুণকে প্রত্যাখ্যান করতেন। কেননা তারা জানতেন পরহেযগার হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ; পরহেযগার হ'তে হলে অনেক সাধনা বা অনেক কষ্ট করতে হয়।

আল্লামা শা'বী (রহঃ) বলতেন, يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ لَسْنَا بِفُقَهَاءَ وَلَا عُلَمَاءَ وَلَكِنَّا قَوْمٌ قَدْ سَمِعْنَا حَدِيْثًا فَنَحْنُ نُحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِعْنَا إِنَّمَا الْفَقِيْهُ مَنْ وَرَعَ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ وَالْعَالِمُ مَنْ خَافَ اللهَ 'হে আলেম সম্প্রদায়! হে ফকীহ সম্প্রদায়! তোমরা মনে রাখবে, আমরা আলেম কিংবা ফকীহ কোনটিই নই, বরং আমরা হলাম এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা একটি হাদীছ শুনেছি তারপর আমরা যা শুনলাম তা তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম। ফকীহ তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন, তা হ'তে বিরত থাকে। আর আলেম তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে'।[৮]

নিম্নে সালাফে ছালেহীনদের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতার কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا (فكل منهما تورع عن أخذ الذهب) قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে। যে ব্যক্তি জমি ক্রয় করেছিল সে তার কেনা সম্পত্তিতে একটি কলসি পেল। তাতে স্বর্ণ ছিল। যে ব্যক্তি জমি ক্রয় করেছিল সে বিক্রেতাকে বলল, তুমি আমার নিকট থেকে তোমার স্বর্ণ বুঝে নাও। আমি তো তোমার নিকট থেকে জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। তখন যে ব্যক্তি সম্পত্তি বিক্রি করেছিল সে বলল, আমি তো তোমার নিকট জমি এবং জমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়েই এক ব্যক্তির নিকট গিয়ে ফায়ছালা চাইল। তখন সে বলল, তোমাদের কি কোন সন্তান আছে? তাদের একজন বলল যে, আমার একটি ছেলে আছে এবং অপর জন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, তোমার ছেলেটিকে (তার) মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দাও এবং এ উপলক্ষে তোমরা তোমাদের উপর তা ব্যয় কর এবং এ থেকে ছাদাক্বাহ কর'।[৯]

ছাহাবায়ে কেরামের পরহেযগারিতা

আবু বকর (রাঃ)-এর পরহেযগারিতা :

আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতার স্থান আকাশচুম্বী। তার তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা একেবারে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছিল। নবী ও রাসূলদের পর তাঁর স্থান সকল মানুষের শীর্ষে। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ হ'তে পারবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ؟ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রতিদিন তার উপর ধার্য কর আদায় করত। আর আবু বকর (রাঃ) তার দেওয়া কর হ'তে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা হ'তে তিনি আহার করলেন। তারপর ক্রীতদাস বলল, আপনি জানেন কি ওটা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, বলত, কিভাবে? ক্রীতদাস উত্তরে বলল, আমি জাহেলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা আমার ভালভাবে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণা করে তা করেছিলাম। আমার সাথে তার দেখা হলে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদিয়া দিল যা হ'তে আপনি আহার করলেন। আবু

৭. বুখারী হা/২৪৩২; মুসলিম হা/১০৭০।
৮. হিলয়াতুল আউলিয়া ৪/৩১১পৃ.।
৯. বুখারী হা/৩৪৭২; মুসলিম হা/১৭২১; (ইঃ ফাঃ হা/৪৩৪৮; ইঃ সেঃ ৪৩৪৮।

বকর (রাঃ) এটা শুধুমাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটের ভিতর যা কিছু ছিল সবই বমি করে দিলেন'।[১০]

ওমর ফারুক (রাঃ)-এর তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা :

عن ابن عمر رضي الله عنها عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبَوَاهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্নিত, তিনি তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য চার কিস্তি তে বাৎসরিক চার হাজার দিরহাম (টাকা) ধার্য করলেন এবং ইবনে ওমরের জন্য নির্বাচন করলেন তিন হাজার পাঁচশ। তাঁকে বলা হ'ল, তিনিও তো মুহাজিরদের। তাঁর জন্য চার হাজার হ'তে কম কেন করলেন? তিনি বললেন, সে তো তার পিতা-মাতার সাথে হিজরত করেছে। কাজেই সে ঐ লোকদের সমান হ'তে পারে না যে লোক একাকী হিজরত করেছে'।[১১]

কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছোট ছিলেন। তাই তাকে তার মাতা-পিতা উভয়ে হিজরত করান। এ কারণে তাকে যারা ইসলামের প্রথম যুগে হিজরত করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ সা'লাবা ইবনু আবী মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মদীনার কিছু সংখক মহিলার মধ্যে কয়েকখানা (রেশমী) চাদর বন্টন করেন। অতঃপর একটি ভাল চাদর রয়ে গেল। তাঁর নিকট উপস্থিত একজন তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ চাদরটি আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নাতনী উম্মু কুলসুম বিনতে আলী (রাঃ) যিনি আপনার নিকট আছেন, তাকে দিয়ে দিন। ওমর (রাঃ) বললেন, উম্মু সালীত (রাঃ) এই চাদরটির অধিক হকদার। উম্মু সালীত (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আতকারিণী আনছার মহিলাদের একজন। ওমর (রাঃ) বলেন, কেননা উম্মু সালীত (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে আমাদের নিকট মশক বহন করে নিয়ে আসতেন'।[১২] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,'تزفر' অর্থ তিনি সেলাই করতেন।

ওমর (রাঃ) কাপড়টি তাঁর স্ত্রীকে দান করতে অস্বীকার করেন। অথচ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাতনী। কারণ তার স্থান উম্মু কুলসুমের নিচে।

যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর পরহেযগারিতা :

আয়েশা (রাঃ) ইফকের (অপবাদের) ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে তার পরহেযগারিতার কারণে হেফাযত করেন। মুনাফিকরা যখন আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে বিপথগামী হলেন এবং তাদের সাথে অন্যান্য লোকেরাও তাদের কথার আলোচনা করতে আরম্ভ করেন, তখন যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর সতীন হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আয়েশা (রাঃ)-এর উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ ও আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি তার বৈপরিত্য থাকা স্বত্বেও আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করেননি। যখন তাকে আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তখন তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে ভাল জানি। তার মধ্যে আমি কখনো কোন খারাপী দেখিনি। তিনি এ ঘটনায় নিজেকে জড়ানো হ'তে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন।

আয়েশা (রাঃ) নিজেই যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বললেন, হে যয়নব! তুমি কী জান? তুমি কী দেখেছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার কান, আমি আমার চোখের হেফাযত করতে চাই। আল্লাহ্র কসম! তার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু আমি জানি না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ তার হেফাযত করেছেন'।[১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর পরহেযগারিতা :

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ فَقُلْتُ لاَ. قَالَ فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ নাফে' (রহঃ)

১০. *বুখারী হা/৩৮৪২।*
১১. *বুখারী হা/৩৯১২।*
১২. *বুখারী হা/২৮৮১।*
১৩. *বুখারী হা/২৬৬১।*

হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে ওমর (রাঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হ'তে সরে গিয়ে আমাকে বললেন, হে নাফে'! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ? আমি বললাম না। অতঃপর তিনি কান হ'তে হাত বের করলেন।[১৪] অথচ আজকের সমাজে গান, বাদ্যযন্ত্র খুবই সস্তা খোরাকে পরিণত হয়েছে যা খুবই দুঃখজনক।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَالٌ

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা হ'তে তিন মারহালা দূরে অবস্থিত 'কাহা' নামক স্থানে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ) ও আমাদের কেউ ইহরামধারী ছিলেন আর কেউ ছিলেন ইহরামবিহীন। এ সময় আমি আমার সাথীদেরকে (ছাহাবীদেরকে) দেখলাম তাঁরা একে অপরকে কিছু দেখাচ্ছেন। আমি তাকাতেই একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। (রাবী বলেন) এ সময় তার চাবুকটি পড়ে গেল। (তিনি উঠিয়ে দেয়ার কথা বললেন) সকলেই বললেন, আমরা মুহরিম। তাই এ কাজে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। অবশেষে আমি নিজেই তা উঠিয়ে নিলাম এরপর ঢিলার পিছন দিক হ'তে গাধাটির কাছে এসে তা শিকার করে ছাহাবীদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ বললেন, খাও, আবার কেউ বললেন, খেয়ো না। সুতরাং গাধাটি আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাদের সকলের আগে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, খাও, এতো হালাল বা বৈধ'।[১৫]

অর্থাৎ, আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর লাঠি মাটিতে পড়ে গেলে তিনি তার নিজের লাঠি নিজেই মাটি থেকে উঠালেন। কোন ছাহাবী তার লাঠিটা তার হাতে তুলে দেননি। কেননা, তারা আশঙ্কা করছিল যদি আমরা তার লাঠি তুলে দেই, তাহলে মুহরিম অবস্থায় তাকে শিকার করার জন্য সহযোগিতা করা হ'ল। কেননা ছাহাবীগণ তখন মুহরিম ছিল আর ক্বাতাদাহ (রাঃ) গায়রে মুহরিম বা হালাল। অতঃপর ছাহাবীগণ আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) কর্তৃক শিকার করা গাধার গোশত খেতে ও সংকোচ বোধ করেন। কেননা তারা চিন্তা করছিল আবু ক্বাতাদাহ শিকার করার প্রতি মনোযোগী হত না যদি তারা তার প্রতি দেখাদেখি না করত। তারা যখন দেখাদেখি করলেন তখন আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) গাধাটিকে শিকার করতে উদ্বুদ্ধ হ'ল। এ কারণে তারা গোশত খেতে চাইছিল না। তারা ধারণা করছিল মুহরিম অবস্থায় শিকারির গোশত খাওয়া যাবে না।

তাবেঈনে এযামের পরহেযগারিতা :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأَهْدَي لَنَا طَائِرٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ. فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আব্দুর রহমান ইবনে ওছমান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা ইহরাম অবস্থায় ত্বালহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তখন আমাদের জন্য একটি পাখি হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করা হ'ল। আমাদের মধ্য হ'তে কেউ কেউ তা হ'তে খেল, আবার কেউ কেউ না খেয়ে থাকল এবং পরহেযগারিতা অবলম্বন করল। অর্থাৎ অনেকেই তা থেকে একটুও খেল না। তারপর যখন ত্বালহা (রাঃ) ঘুম থেকে উঠল, তখন তিনি যারা খেয়েছে তাদের সাথে একমত হন এবং তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এ ধরনের পাখির গোশত খেয়েছি।[১৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ)-এর পরহেযগারিতা :

حَكَى الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ مِنْ دَقِيْقِ الْوَرَعِ أَنَّهُ اِسْتَعَارَ قَلَمًا مِنْ رَجُلٍ بِالشَّامِ وَحَمَلَهُ إِلَى خُرَاسَانَ نَاسِيًا فَلَمَّا وَجَدَهُ مَعَهُ بِهَا رَجَعَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى أَعْطَاهُ لِصَاحِبِهِ-

হাসান ইবনে 'আরাফাহ (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সূক্ষ্ম বিষয়ে যে পরহেযগারিতা অবলম্বন করতেন, তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি একদিন শামের এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কলম ধার নেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ভুলে গিয়ে তা খোরাসানে নিয়ে আসেন। অতঃপর যখন সে কলমটি হাতে পান, সাথে সাথে সে পুনরায় শামে চলে আসেন এবং কলমটিকে তার প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দেন।[১৭]

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলো বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহতে ভরপুর। তবে যারা জ্ঞানী তাদের জন্য দু-একটি ঘটনাই উপদেশ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রবাদে রয়েছে, 'জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

(চলবে)

[লেখক : শিক্ষক, ইক্বরা ইসলামিয়া মডেল মাদরাসা, বি-বাড়িয়া]।

১৪. *আবু দাউদ হা/৪৯২৬; আহমাদ হা/৪৫৩৫, আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।*
১৫. *বুখারী হা/১৮২৩।*
১৬. *তাফসীরে ত্বাবারী ৫/৬৪ [১১/৮৫, হা/১২৭৭২।*
১৭. *তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩৩৭ [২০/৩৫৬।*

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

-আব্দুর রহীম

(৯ম কিস্তি)

দুনিয়ার প্রতি উছমান (রাঃ)-এর অনীহা :

ইসলামের তৃতীয় খলীফা, রাসূল (ছাঃ)-এর দুই মেয়ের জামাতা, দুই নূরের অধিকারী নামে খ্যাত উছমান বিন আফফান (রাঃ) দুনিয়ার প্রতি কোন মূল্য দিতেন না। তিনি যেমন ধন-সম্পদকে কোন গুরুত্ব দিতেন না তেমনি তিনি পোষাক-পরিচ্ছদকে গুরুত্ব প্রদান করতেন না। এমনকি তিনি নিজের জীবনের প্রতিও সামান্য গুরুত্ব দিতেন না। যখন লোকেরা তাকে হত্যার জন্য তার বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিল তখনও তিনি নিজের জীবনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে পরকালকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি আদমের শান্তিপ্রিয় সন্তান হাবীলের অবস্থান গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় শৃংখলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি সম্পদশালী হয়েও কখনো অহংকার করেননি। তিনি ক্ষমতাবান হয়েও কখনো ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। সেজন্য তিনি দুনিয়াতে যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় পাত্র ছিলেন আখোতেও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অবস্থান করবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর রোগশয্যায় বলেন, 'আমি আশা করি যে, এ সময় আমার কোন ছাহাবী আমার নিকট উপস্থিত থাকুক। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আপনার কাছে আবুবকরকে ডেকে আনব? তিনি নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার কাছে ওমরকে ডেকে আনব? তিনি এবারও নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার নিকট উছমানকে ডেকে আনব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর উছমান এলেন। তিনি তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন। উছমান (রাঃ)-এর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, আমার নিকট উছমানের মুক্ত দাস আবু সাহলাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উছমান ইবনু আফফান নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বললেন, রাসূল (ছাঃ) আমার থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তাতে ধৈর্যধারণ করব। আলী ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, উছমান বলেছেন, আমি তাতে ধৈর্যধারণ করব। ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, ছাহাবীদের মতে, রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর একান্ত আলাপ'।[১]

সম্পদের প্রতি অনীহা :

ধন-সম্পদ তারাই অকাতরে দান করতে পারে যাদের সম্পদের প্রতি কোন লোভ লালসা নেই। উছমান (রাঃ) পরকালের জন্য মূল্যহীন এই সম্পদকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। যখনই রাসূল (ছাঃ) দানের কথা বলতেন তখনই তিনি তার মূল্যবান সম্পদগুলো দান করে দিতেন। এভাবেই তিনি দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনীহা প্রদর্শন করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, আহনাফ ইবনু কায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা (বাড়ি হ'তে) হজ্জ করার জন্য (বের হয়ে) মদীনায় পৌঁছলাম। আমরা আমাদের মনযিলে পৌঁছে আমাদের মাল-সামান যখন নামিয়ে রাখছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বললেন, লোকজন মসজিদে একত্রিত হয়েছে এবং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত। এরপর আমরা গিয়ে দেখলাম যে, মসজিদের মাঝখানে কয়েকজনকে ঘিরে কিছু লোক একত্রিত রয়েছে এবং এদের মধ্যে আছেন আলী, যুবায়ের, তালহা এবং সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)। আমরা তাদের সঙ্গে বসলাম। এমতাবস্থায় উছমান ইবনু আফফান (রাঃ) উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গায়ে একখানা হলুদ রংয়ের চাদর ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। এরপর তিনি বললেন, এখানে কি আলী (রাঃ) আছেন, এখানে কি তালহা (রাঃ) আছেন, এখানে কি যুবায়ের (রাঃ) আছেন, এখানে কি সা'দ (রাঃ) আছেন? তারা বললেন, হ্যাঁ, (আমরা এখানে উপস্থিত আছি)।

উছমান (রাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অমুক গোত্রের (উটের) বাথান যে ক্রয় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি ঐ স্থানটি বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার (দিরহাম) দিয়ে ক্রয় করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ খবর দেই। তখন তিনি বললেন, তুমি তা আমাদের মসজিদের জন্য (ওয়াকফ করে) দিয়ে দাও। এর ছওয়াব তুমি পাবে। তারা বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী। উছমান (রাঃ) আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি-যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'রূমা' কূপ যে ক্রয় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তখন আমি তা এত এত মূল্যে ক্রয় করি এবং আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, আমি তা এত এত মূল্যে ক্রয় করি। তিনি বললেন, তুমি তা মুসলমানদের পানি পান করার জন্য (ওয়াকফ্ করে) দিয়ে দাও, আর এর ছওয়াব তুমি পাবে। তখন তারা বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী। তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি- যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যে এদের যুদ্ধের সামান অর্থাৎ অনটনগ্রস্ত (তাবুক) বাহিনীর

১. *ইবনু মাজাহ হা/১১৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯১৮; আহমাদ হা/২৫৮৩৯।*

ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন আমি তাদের জন্য এমন সামানের ব্যবস্থা করলাম যে, তারা একটি রশি বা লাগামের অভাব অনুভব করল না। তারা বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী! তিনি বললেন, আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন! আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন'।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছুমামা বিন হাযন আল কুশাইরী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, উছমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি প্রাসাদ থেকে নিচের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ঐ দু'জন ব্যক্তিকে ডাকো যারা আমার উপর ক্ষেপে আছে। তাদেরকে ডাকা হলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি জান না যখন রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে আসলেন তখন মসজিদের জায়গায় মুছল্লীদের জন্য সংকুলান হচ্ছিল না তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তার খাঁটি সম্পদ দ্বারা এই স্থানটি ক্রয় করে দিবে এবং সেখানে অন্যান্য মুসলমানদের মত তার অধিকার থাকবে। আর এর বিনিময়ে সে পরকালে জান্নাতে এর থেকে উত্তম স্থান পাবে? তখন আমি সেটি ক্রয় করে সকল মুসলিমের জন্য উন্মুক্ত করে দেই। আর আজকে তোমরা আমাকে সেখানে দুই রাক'আত ছালাত আদায়ে বাধা দিচ্ছ?। তিনি আরো বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি জান রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন সেখানে রূমা কুপ ছাড়া কোন মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ছিলনা। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের কে আছে যে এই কুপটি তার খাঁটি সম্পদ দ্বারা ক্রয় করবে। অতঃপর সেখানে তার বালতি প্রবেশের অধিকার থাকবে যেমন অন্যান্য মুসলামানেরও থাকবে। আর এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে উত্তম কিছু থাকবে'। তখন আমি আমার খাঁটি সম্পদ দ্বারা ক্রয় করে দান করে দেই। আর আজকে তোমরা আমাকে সেখান থেকে পানি পানে বাধা দিচ্ছ? এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কঠিন সময়ের তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম, হ্যাঁ'।[৩]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, উছমানের মুক্ত গোলাম আবু ছালেহ বলেন, আমি মীনায় উছমানকে বলতে শুনেছি, হে জনতা, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকট থেকে একটি হাদীছ শুনেছি, সেটি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। তিনি বলেন, আল্লাহ্র পথে একদিন পাহারা দেয়া অন্য ক্ষেত্রে এক হাজার দিন পাহারা দেয়ার চেয়ে উত্তম। অতএব, প্রত্যেক মানুষের যেভাবে ইচ্ছা পাহারা দেয়া উচিত। আমি কথাটা পৌঁছে দিয়েছি তো? সবাই বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। উছমান বিন আফফান (রাঃ) উবায়দুল্লাহ বিন আদী ইবনুল খিয়ারকে বললেন, হে ভাতিজা, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে জীবিত পেয়েছ? সে বলল, না, তবে তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস আমার নিকট এমন নির্ভেজাল ও খাঁটিভাবে পৌঁছেছে, যেমন খাঁটি ও নির্ভেজাল থাকে কুমারীর কুমারীত্ব তার নির্জন কক্ষে। এরপর উছমান (রাঃ) কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, এখন তোমরা শোন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি (সেই সত্যকে গ্রহণের জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াত গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিকট যে বাণী এসেছে তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। তারপর উভয় হিজরতে (হাবশায় ও মদীনায়) শরীক হয়েছি যেমন আগে বলেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামাতাও হয়েছি এবং তাঁর নিকট বায়আতও করেছি। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ তাঁকে যেদিন তুলে নিয়েছেন, সেদিন পর্যন্ত আমি কখনো তাঁর নির্দেশ অমান্যও করিনি এবং তাকে ধোঁকাও দিইনি।[৪]

আবু সালামা বিন আবদুর রহমান বলেন, উছমান (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ, তখন প্রাসাদ থেকে নিচের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করি, হেরার দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কে ছিল, যখন পাহাড় কেঁপে উঠেছিল? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে পা দিয়ে লাথি মারলেন, তারপর বললেন, থামো হেরা, তোমার ওপরে একজন নবী, একজন ছিদ্দীক ও একজন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই। তখন আমি তার সাথেই ছিলাম। উছমানের এ কথায় অনেকেই কসম খেয়ে সমর্থন জানালো। উছমান (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, বাইয়াতুর রিযওয়ানের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাথে কে ছিল? যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে মক্কার মুশরিকদের নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, এটা আমার হাত, আর এটা উছমানের হাত। এভাবে আমার জন্য বায়'আত নিলেন। এ কথার পক্ষেও সমবেত লোকদের অনেকে সায় দিল। উছমান (রাঃ) বললেন, সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কে ছিল যখন তিনি বললেন, এই বাড়িটি কিনে দিয়ে কে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করিয়ে দেবে? এর বিনিময়ে সে জান্নাতে একটা বাড়ি পাবে। তখন আমি নিজের টাকা দিয়ে বাড়িটি কিনে দিলাম এবং তা দ্বারা মসজিদের সম্প্রসারণ করলাম। অনেকেই তার এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দিল। উছমান (রাঃ) পুনরায় বললেন, মুছীবতের বাহিনীর দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কে ছিল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আজকে কে এমন দান করবে, যা আল্লাহ্র নিকট কবুল হয়ে গেছে? আমি তৎক্ষণাৎ অর্ধেক বাহিনীকে নিজের টাকায় যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করলাম। আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি সেই জলাশয়টির কাছে কে ছিল, যার পানি পথিকের নিকট বিক্রি করা হত? আমি নিজের টাকা দিয়ে সেটি কিনে দিয়েছি। এভাবে মুসাফিরের জন্য সেই জলাশয়কে অবাধ করে দিয়েছি (যার ফলে এখন

---

২. নাসাঈ হা/৩১৮২; আহমাদ হা/৫১১; ইবনু হিব্বান হা/৬৯২০।

৩. দারাকুৎনী হা/৪৪৩৯; আহমাদ হা/৫৫৫,সনদ হাসান।

৪. বুখারী হা/৩৬৯৬; আহমাদ হা/৪৮০; মাজামা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪৫৩৬৩।

সে জলাশয় থেকে বিনা মূল্যে পানি পাওয়া যায়)। এ সময়ও বহু লোক তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিল।[৫]

রাত জেগে ইবাদত :

উছমান বিন আফফান (রাঃ) দানশীলতার মাধ্যমে যেমন দুনিয়ার সম্পদের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছেন তেমনি পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য রাত জেগে কুরআন তেলাওয়াত ও ছালাত আদায়ে রত থেকেছেন। এমনকি তিনি এক রাক'আত বিতরে কুরআন খতম করেছেন। তিনি নিয়মিত ছালাতুল লায়ল বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতেন। যেমন বিভিন্ন আছারে এসেছে-

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ حِينَ قُتِلَ : لَقَدْ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنَّهُ لَيُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ-

ইবনু সীরীন বলেন, উছমান (রাঃ)-এর স্ত্রী তার হত্যাকালীন বলেছিলেন, তোমরা তাকে হত্যা করলে? অথচ তিনি এক রাক'আতে পুরো কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন।[৬]

আব্দুর রহমান তায়মী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আজকে রাত জাগরণে আমার উপর কেউ বিজয়ী হ'তে পারবেনা। আমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় শুরু করলাম। হঠাৎ করে আমি পিছন থেকে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করলাম। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি উছমান বিন আফফান (রাঃ)। আমি তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলাম। তিনি ছালাত শুরু করলেন এবং কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করলেন। অতঃপর রুকু সিজদাহ করে তিনি ছালাত শেষ করলেন। আমি বললাম, এই বৃদ্ধ হয়ত সন্দেহে পড়েছেন। ছালাত শেষে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি তো এক রাক'আত আদায় করলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এইটা আমার বিতরের ছালাত'।[৭]

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ مَا كَانَ يُوقِظُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ يَقْظَانَ فَيَدَعُوهُ فَيُنَاوِلُهُ وُضُوءَهُ وَكَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ-

যুবায়ের ইবনু আব্দিল্লাহ তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উছমান (রাঃ) রাতে তার পরিবারের যাকেই ঘুম থেকে জাগ্রত করতেন সে-ই উছমান (রাঃ)-কে জাগ্রত অবস্থায় পেত। তিনি তাকে উঠাতেন এবং ওযূর পানি ধরাতেন। আর তিনি নিয়মিত ছিয়াম পালন করতেন (প্রতি মাসে আইয়ামে বিযের ছিয়াম পালন করতেন)।[৮]

আব্দুল্লাহ বিন রূমী বলেন,

كَانَ عُثْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَأْخُذُ وَضُوءَهُ قَالَ :فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ : أَلَا تَأْمُرُ الْخَدَمَ يُعْطُونَكَ وَضُوءَكَ ؟ قَالَ : لَا إِنَّ النَّوْمَ لَهُمْ يَسْتَرِيحُونَ فِيهِ-

উছমান (রাঃ) যখন রাতের ছালাতের জন্য জাগ্রত হতেন তখন ওযূর পানি নিতেন। তার পরিবারের কোন একজন বলল, আপনি খাদেমকে নির্দেশ দিলেন না কেন যে আপনাকে ওযূর পানি দিত? তিনি বললেন, না। তারাও ঘুমের মধ্যে বিশ্রাম করে থাকে'।[৯]

আমরা বিনতে কায়েস বলেন, আমি ওছমানের শাহাদাতের বছর আয়েশার সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মদীনা অতিক্রম করার সময় ঐ কুরআন খানা দেখলাম যেটা কোলে থাকা অবস্থায় উছমান (রাঃ)-কে হত্যা করা হয়। তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করার সময় প্রথম যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল তা নিম্নের আয়াতটির উপর فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' আমরাহ বলেন, তাদের মধ্যে একজন লোকও ছহীহ সালামতে মৃত্যুবরণ করেনি।[১০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ওছমান (রাঃ)-কে চল্লিশ রাত অবরোধ করে রাখা হয়। তিনি আমাকে বললেন, সাহরীর সময় আমাকে রাতে জাগিয়ে দিবে। আমি তার বাসায় আসলাম। সাহরীর সময় হলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমেনীন আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন সাহরীর সময় হয়েছে। তখন তিনি এভাবে কপাল মাসাহ করে বললেন, সুবহানাল্লাহ হে আবু হুরায়রা ! তুমি আমার স্বপ্নটা ভেঙ্গে দিলে যাতে আমি রাসূল (ছাঃ) কে দেখছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আগামীকাল আমাদের সাথে ইফতার করবে। সেদিনই তাকে হত্যা করা হয়'।[১১] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, ওছমান (রাঃ) বলেছেন, لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন হলে তোমরা কখনো আল্লাহর কালাম পাঠ করে পরিতৃপ্ত হতেনা।[১২] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, উছমান (রাঃ)

---

৫. আহমাদ হা/৪২০, ৫৫৫, ৫১১; নাসাঈ হা/৩৬০৯, সনদ ছহীহ।

৬. সুনানু সাঈদ ইবনু মানছূর ২/৪৬৯; আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ ১/১২৭; ইবনুল মুবারক হা/১২৭৭, রিজাল ছহীহ, তবে এক রাতে কুরআন খতমের বিষয়টি হাদীছ বিরোধী হওয়ায় কেউ কেউ মতন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। ইমাম নববী বলেন, কুরআন খতমের সর্বনিম্ন সময়ের সীমা নেই। এটি ব্যক্তির অনুধাবন শক্তির উপর নির্ভরশীল (ফাৎহুল বারী ৯/৯৭)।

৭. শারহু মা'আনিল আছার হা/১৬১৯; ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ হা/১২৭৬; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৪৫৬১; দারাকুৎনী হা/১৫।

৮. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ ১/১২৬; ফাযায়েলুছ ছাহাবা হা/৭৪২; আর রিয়াযুন নাযরা ফী মানাকিবিল আ'শরা ৩/৪৬।

৯. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ ১/১২৭, রেজাল ছহীহ।

১০. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ ১/১২৮; ফাযায়েলুছ ছাহাবা হা/৮১৭; আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ফাযায়েলু উছমান হা/১৪১।

১১. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ ১/১২৮।

১২. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ ১/১২৮; ফাযায়েলুছ ছাহাবা হা/৭৭৫; আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ফাযায়েলু উছমান হা/৬৬।

বলেছেন, وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ وَلَا لَيْلَةٌ إِلَّا أَنْظُرُ فِي اللَّهِ يَعْنِي الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ 'আমার নিকট প্রিয় কাজ হ'ল যে এমমন কোন দিন বা রাত অতিক্রম করবে না যেখানে আমি কুরআন থেকে তেলাওয়াত করব না'।[১৩]

সাধারণ জীবন-যাপন :

উছমান (রাঃ) নিরহংকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের খলীফা হয়েও কখনো নিজেকে বড় মনে করতেন না। বরং সর্বদা সবার সাথে মিশতেন। তার কোন রাজপ্রাসাদ ছিলনা। সেজন্য দেখা যায় তিনি মসজিদে শুয়ে বিশ্রাম করতেন। এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করার জন্য মাগরিবের পর থেকে মসজিদে বসে থাকতেন। এমনকি তিনি গাধার উপর আরোহন করতেন এবং তার পিছনে তার দাসকে বসাতেন। যেমন বিভিন্ন আছারে বর্ণিত হয়েছে।

হাসান বছরী (রহঃ) হামাদানীর সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি উছমান (রাঃ)-কে চাদর পরিহিত অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি। তার পাশে কেউ ছিল না। অথচ তখন তিনি আমীরুল মুমিনীন (মুসলমানদের নেতা)।[১৪]

মায়মূন বিন মেহরান বলেন, হামদানী উছমান বিন আফফান (রাঃ)-কে দেখেন যে, তিনি একটি গাধার উপর আরোহন করে আছেন আর পিছনে বসে আছে তার অনুগ্রহ প্রাপ্ত দাস। তখন তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলীফা।[১৫]

ইউনুস বিন ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, 'মসজিদে কায়লুলা করা সর্ম্পকে হাসানকে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, আমি ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-কে মসজিদে কায়লূলা করতে দেখেছি। তখন তিনি খলীফা ছিলেন। তিনি যখন দাঁড়াতেন তার পিঠে কঙ্করের দাগ পড়ে থাকত। বলা হত এইতো আমীরুল মুমেনীন, এইতো আমীরুল মুমেনীন।[১৬]

দামী খাদ্যের প্রতি অনীহা :

উছমান (রাঃ) দুনিয়ার মূল্যহীনতা বুঝাতে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ খাবার গ্রহণ করতেন। তিনি প্রজাদের মূল্যবান খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেও নিজে স্বল্প মূল্যের খাবার গ্রহণ করতেন। এমনকি তিনি দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোন খাবার অহংকার প্রদর্শন বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হলে সেটা তিনি বর্জন করতেন। যেমন শুরাহবীল বিন মুসলিম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওছমান (রাঃ) লোকদের রাজকীয় খাবার খাওয়াতেন। আর তিনি বাড়িতে প্রবেশ করে তেল ও সিরকা খেতেন'।[১৭]

হুমাইদ বিন নুআঈম বলেন, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে একটি দাওয়াতে আহ্বান করা হ'ল। রাস্তায় বের হওয়ার পর উছমান (রাঃ) ওমর (রাঃ) কে বললেন, আমার এমন একটি দাওয়াতে হাযির হলাম যাতে উপস্থিত না হওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, কেন? তিনি বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এই খাবার গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে'।[১৮]

হানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উছমান (ছাঃ) যখন কোন কবরের সামনে দাঁড়াতেন তখন খুবই কাঁদতেন এমন কি তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল, আপনার কাছে জান্নাত-জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হলে আপনি কাঁদেন না অথচ এই ক্ষেত্রে এত কাঁদেন কেন? তখন তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আখিরাতের মানযিলসমূহের প্রথম মানযিল হ'ল কবর। যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পেয়ে যাবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পাবে না তার জন্য পরবর্তী মানযিলসমূহ আরো কঠিন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি এমন কোন দৃশ্য কখনো দেখিনি যার থেকে কবর ত্রাসজনক নয়।[১৯]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ غُلَامَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، تَزَوَّجَ فَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : أَمَا إِنِّي صَائِمٌ غَيْرَ أَنِّي أَجَبْتُ أَنْ أُجِيبَ الدَّعْوَةَ ، وَأَدْعُو بِالْبَرَكَةِ–

আবু উছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মুগীরা বিন শু'বার দাস বিবাহ করলে উছমান (রাঃ)-এর নিকট দাওয়াত পাঠানো হল তখন তিনি ছিলেন বিশ্বজাহানের খলীফা। তার নিকট আসলে তিনি বললেন, আমি তো ছায়েম, তবে আমি দাওয়াত কবুল করা ও নবদম্পত্তির জন্য দো'আ করাকে পসন্দ করি।[২০]

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আবাস। যারা এই মূল্যহীন পৃথিবীকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে তারা কখনো কোন ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেনা। কারণ তারা বিশ্বাস করে যেকোন মুহূর্তেই রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যেতে হবে পরপারে। সেজন্য দেখা যায় আবুবকর, ওমর, উছমান, আলীসহ অন্যান্য ছাহাবীগণ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে মোটেও মূল্য দিতেন না। তারা দুনিয়াকে মুসাফিরখানা ধরে পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করতেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্ত বায়ন করার তাওফীক দান করুন-আমীন! (ক্রমশঃ)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

১৩. *আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ফাযায়েলু উছমান হা/৬৬।*
১৪. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, ফাযায়েলুছ ছাহাবা হা/৮০০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৫৯; আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ফাযায়েলে উছমান হা/৯১।*
১৫. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ ১/১২৭; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৬০।*
১৬. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৪১৩৮; আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ ১/১২৭।*
১৭. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ ১/১২৯; আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন, আয-যাকাত ৩৪ পৃ.।*
১৮. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ ১/১২৬; আহাদীছু আফফান বিন মুসলিম হা/ ১৯২; ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ হা/২০১, রেজাল ছহীহ।*
১৯. *তিরমিযী হা/২৩০৮; আহমাদ হা/৪৫৪; মিশকাত হা/১৩২।*
২০. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ ১/১২৯; ইবনু শুবাহ, তারীখুল মাদীনা ৩/১০১৯।*

নারীর মূল কর্মক্ষেত্র

-এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ

নারীকে অসম্মান করে কোন জাতি কোন উন্নতি করতে পারেনি। বরং আরো অধঃপতিত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। ইতিহাস সে কথাই বলে। পাশ্চাত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে আমরাও আমাদের মা বোনদের কখনো অর্ধনগ্ন আবার কখনো নগ্ন করে ছেড়েছি। অথচ এটা আমরা বিনোদন বলে চালাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে নারী জাতিকে তার পূর্ণ মর্যাদা দান করে বিশ্বে বিপ্লব এনেছিলেন। মায়ের পদতলে জান্নাত, তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। তাঁর পূর্বে মা-বোনদের এত সম্মানের কথা কেউই কোন কালে শুনেনি। তবে এই সম্মান নির্ভর করে নারীর শালীনতা ও তাকওয়াশীলতার উপর। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)* ।

আয়াতটির পটভূমি স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বাস্তবায়নের সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন ইসলামের দুশমনরা বিকাশমান মুসলিম সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিহীন করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে। ইসলাম একদিকে নৈতিক পবিত্রতা পরিশুদ্ধি আল্লাহ্র প্রতি ঐকান্তিকতা একাগ্রতার আহ্বান জানাচ্ছিল। অন্যদিকে কাফের শক্তি সমাজে নানারূপ বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিল। এই সময় মুসলিম শক্তি ও কাফের শক্তির মধ্যে যে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছিল তাতে ইসলাম তার সমাজ সংস্থাকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার ও মুসলিম উম্মাহকে সুদৃঢ় রাখার জন্যে সমাজের লোকদের পুনর্বিন্যাস করার তীব্র প্রয়োজন বোধ করে; দেশ ও সমাজের সংরক্ষণে নবতর আইন বিধান উপস্থাপন করে। তাতে পুরুষ লোকদেরকে সকল প্রকার আক্রমণ ও ফেৎনা-ফাসাদের মোকাবেলা করার জন্য সারিবদ্ধ করা হ'ল এবং নারীকে নির্দেশ দেওয়া হয় গৃহক্ষেত্রে শক্ত হয়ে সর্বপ্রকার ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার। কেননা সমাজে গৃহদূর্গই গোটা সমাজের স্থিতির মূল কেন্দ্র। বাহিরের মুকাবিলায় পরাজিত হলেও মানুষ গৃহ দূর্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু যে সব সংগ্রামীদের গৃহদূর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাতে শত্রু পক্ষের অনুপ্রবেশ ঘটে, সেই সংগ্রামীদের আশ্রয় নেয়ার আর কোন স্থানই অবশিষ্ট থাকে না। এই দূর্গে শক্তিমান রক্ষী হ'তে পারে সমাজের মহিলারা। তারা এই গৃহদূর্গের নিজেদের মান-সম্ভ্রম ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে গোটা সংগ্রামী বাহিনীকে বিরাট সাহায্যদানের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করতে পারে।

বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দ্বিধা-সংকোচমুক্ত হয়ে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের সংরক্ষণের দায়িত্ব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপরেই অর্পণ করেছে বটে; কিন্তু কার্যতঃ এই দুই লিঙ্গের সংগ্রামক্ষেত্র এক ও অভিন্ন রাখেনি। ইসলাম পুরুষদের চালিত করাতে চায় অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আর মহিলাদের জন্য প্রকৃত সংগ্রাম ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাদের গৃহকোণকে। উভয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পূর্ণ শৃংঙ্খলা ও দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থেকে কুফুরী আদর্শ ও কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে। আর

সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট ফ্রন্টে অবিচল হয়ে থাকার উপরই নির্ভর করে সংগ্রামে বিজয় লাভের সম্ভাবনা। একটি বাহিনীও যদি নিজের ক্ষেত্র ত্যাগ করে, তাহলে পরাজয় অবধারিত। এই বিষয়ে ওহোদ যুদ্ধ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রায় ৭০০ জন সৈন্য ছিল। প্রচন্ড যুদ্ধ শেষে একটি ভুলের জন্য মুসলমানদের সাক্ষাৎ বিজয় অবশেষে বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

বর্ণিত আলোচনার আলোকে উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা চান মহিলা সমাজ তাদের গৃহ কোণকেই নিজেদের স্থায়ী কর্মক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করুক এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ভুল যেন তারা কখনই না করে। অন্যথায় সংগ্রামে শুধু পরাজয়ই বরণ করতে হবে না, বরং চরমভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে ইসলামের গোটা সমাজ প্রাসাদ।

মহিলারা খোলামেলা অবস্থায় গৃহদূর্গের বাইরে গেলে একশ্রেণীর বিপথগামী যুবসমাজ আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে ছোবল দিবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই জন্য মহান আল্লাহ মহিলাদের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সাবধান করে দিয়েছেন। নারীরা যখন তাদের যরূরী কাজে গৃহ-দূর্গ ত্যাগ করবে তখন তারা নিজেদের মান-সম্মান ও পবিত্রতা অক্ষুন্ন রেখে পর্দা করে বের হবে। বর্তমান সমাজে যেসব বিপদজনক ঘটনা ঘটছে তা নারীদের পর্দা ছাড়া গৃহ দূর্গ ত্যাগ করে খোলামেলা অবস্থারই ফল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মানুষের উপর শয়তানের পক্ষ থেকে প্রথম হামলা ছিল তার দেহ থেকে কাপড় খুলে বিবস্ত্র করা। আজও পৃথিবীতে শয়তানের পদাংক অনুসারী ও ইসলামের শিখন্ডীদের প্রথম কাজ হল তথাকথিত ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার নামে নারীকে বিবস্ত্র করে ঘরের বাইরে আনা ও তার সৌন্দর্যহানি করা। অথচ পৃথিবীতে বিগত সভ্যতাগুলি ধ্বংস হয়েছে মূলতঃ নারী ও মদের সহজলভ্যলতার কারণেই। অতএব সভ্য ভদ্র ও আল্লাহভীরু বান্দাদের নিকটে ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয হল স্ব স্ব লজ্জাস্থান আবৃত রাখা এবং ইয্যত আবরূর হেফাযত করা। অন্যান্য ফরয সবই এর পরে। নারীর পর্দা কেবল পোষাকে হবে না, বরং তা হবে তার ভিতরে তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে ও চাল-চলনে সর্ব বিষয়ে। পরনারীর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর পর পুরুষের হৃদয়ে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। অতএব লজ্জাশীলতাই মুমিন নর-নারীর অঙ্গ ভূষণ ও পারস্পারিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে একে অপরের থেকে স্ব স্ব দৃষ্টিকে অবনত রাখবে *(নূর ২৪/৩০-৩১)* এবং পরস্পরে সার্বিক পর্দা বজায় রেখে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকু স্বাভাবিকভাবে সংক্ষেপে বলবে। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে এক অপরে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও পর্দা বজায় রেখে স্ব স্ব কর্মস্থলে ও কর্মপরিধির মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং সংসার ও সমাজের কল্যাণে সাধ্যমত অবদান রাখবে। নেগেটিভ ও পজেটিভ পাশাপাশি বিদ্যুৎবাহী দুটি ক্যাবলের মাঝে প্লাস্টিকের অবরণ যেমন পর্দার কাজ করে এবং অপরিহার্য এক্সিডেন্ট ও অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা করে, অনুরূপভাবে পর নারী পর পুরুষের মধ্যকার পর্দা উভয়ের মাঝে ঘটিতব্য যে কোন অনাকাংখিত বিষয় থেকে পরস্পরকে হেফাযত করে। অতএব শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতের পবিত্র পরিবেশে আদি পিতামাতার জীবনে ঘটিত উক্ত অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা থেকে দুনিয়ার এই পঙ্কিল পরিবেশে বসবাসরত মানব জাতিকে আরও বেশী সর্তক ও সাবধান থাকা উচিৎ।

পরিশেষে বলবো যে সর্বাগ্রে নিজ নিজ ব্যক্তি জীবনে ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে নিয়ে যে পথে রাসূল (ছাঃ) এগিয়েছিলেন সে পথে আমাদের এগোতে হবে। তাই আসুন! আমরা নারীদেরকে খোলামেলা পোষাকে হাটে বাযারে ঘাটে কাফেরদের অনুসরণ করে দেহ প্রর্দশন করা থেকে বিরত রাখি এবং নারীর মূল কর্মক্ষেত্র গৃহদূর্গ রেখেই বিশ্বনবীর দিক নিদের্শনা মোতাবেক পরিচালিত করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন।

[লেখক : সিনিয়র এ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, রাজশাহী]

জানার আছে অনেক কিছু

১.

'সহজ' মানে যা জন্মের 'স', অর্থাৎ যার বোধ জন্মের সহগামী। বাংলা 'জ' দিয়ে প্রায়শই জন্ম বোঝায়, যেমন পঙ্কজ -যা পঙ্কে জন্মায়। একইভাবে, কামজ, কালজ, জলজ ইত্যাদি শব্দ তৈরী। তো, যে জন্মগত বোধ সবার জন্যেই অনায়সে লভ্য, তাকেই বলা হয় 'সহজ'। বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শনের শরণ নেওয়া ছাড়াও সহজের অর্থ বোঝা সহ-জ!

'ভাব' শব্দের সাথে ধাতু 'ভূ' এর সম্পর্ক। 'ভূ' মানে হওয়া, হয়ে উঠা, উৎপন্ন হওয়া। যেমন, উদ্ভিদ মানে যা ভেদ করে উঠে। সুতরাং ভাব মানে যা আমাদের ভেতর থেকে জন্ম নেয়; যা আমাদের ভেতরে উৎপন্ন হয়, সেই চিন্তা-অনুভবের একাকার বা লীনাবস্থাই ভাব।

২.

বাংলাভাষায় 'না' দিয়ে শেষ হওয়া শব্দগুলো বেশ তাৎপর্যবহ। ধরা যাক, খানা, কল্পনা, বাসনা এই শব্দত্রয়ী। যেন খেতেও বলা হচ্ছে, আবার 'না'ও করা হচ্ছে। পরিমিত আহারের ব্যঞ্জনা দেখতে ভালো লাগে এই 'খানা' শব্দে।

'কল্পনা' মানে 'যা কল্প না'। অনেক বাস্তবতার প্রথম উদয় ঘটে কল্পনার যমীনে, আর যে কল্পনা করে সেও তো আর 'কল্প' না। এইভাবে বাংলা 'কল্পনা' শব্দটিতে বাস্তবের চিহ্ন লেগে থাকে। কল্পনার আরেক অর্থ তর্ক। রঘুনাথ শিরোমণি আলোচনা করেছেন এ নিয়ে।

'বাসনা' মানে যা বাস করেনা, যে থিতু হয়না, যে 'নাই' এর স্বপ্ন ধারণ করে যেন 'আছে' হয়ে আছে। বাসনামাত্রই নাকি অতৃপ্ত।

বাংলা শব্দের ভেতর অনেক ভাবের খনি আছে, যেমন সব ভাষারই থাকে। খনন প্রয়োজন, কিছু 'কল্পনা' আর কিছু ইতিহাস দিয়ে। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বিবর্তন ঘেঁটে ঘেঁটে চিন্তার ইতিহাসের খোঁজ করায় কিছুটা সমস্যা থাকলেও, নগদ লাভও আছে *(সূত্র : ইন্টারনেট)*।

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও তার অসারতা

- ইউভাল নোয়া হারারি

[ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আমাদের সমাজে একশ্রেণীর বোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত একটি বিষয়। এর পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়দিকে রয়েছে শক্তিশালী গোষ্ঠী। বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়াতে ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসন প্রভৃতি কল্পিত গুপ্ত দল সম্পর্কে প্রায়শই তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠে। একদল আলেমও এর সাথে যোগ দিয়ে ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, ক্বিয়ামত প্রভৃতি নিয়ে আশ্চর্য সব ভবিষ্যৎবাণী করে থাকেন। করোনা মহামারী নিয়েও কম ডালপালা গজায়নি। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি দি নিউইয়র্ক টাইমস (২০.১১.২০)-এ When the World Seems Like One Big Conspiracy (গোটা পৃথিবীকেই যখন ষড়যন্ত্রের কবলে বলে মনে হয়) শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ইসরায়েলী গ্রন্থকার ও তেলআবীব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ***ইউভাল নোয়া হারারি*** *রচিত নিবন্ধটি অনুবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষার্থী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘ-এর সাংগঠনিক সম্পাদক* ***আসাদুল্লাহ আল-গালিব*** *-নির্বাহী সম্পাদক]*

বিশ্বে অনেক রকম ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কথা শোনা যায়। ষড়যন্ত্র কথাটি শুনলে মনের মধ্যে এক ধরণের টানটান উত্তেজনা অনুভূত হয়। বারবার মনে উকিঁঝুকি মারতে থাকে, কি জানি হয়ত গোটা পৃথিবীই কোন এক ধরণের ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে আছে। এ বিষয়ে মজাদার আলোচনার ইতিবৃত্ত বলতে গেলে আমাদের সবচেয়ে পরিচিত 'গ্লোবাল কেবাল তত্ত্ব' (Global Cabal Theory) একবার ঢুঁ মেরে আসতে হবে।[১] পর্দার ওপাশ থেকে একদল লোক বিশ্বের সব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীটা তারাই চালায়, এরকম কোনো তত্ত্বে বিশ্বাস করে কিনা মর্মে সম্প্রতি বিশ্বের ২৫টি দেশের ২৬০০০ মানুষের উপর একটি জরিপ চালানো হয়েছে।

এতে ৩৭% আমেরিকান মনে করেন, 'এধরনের কিছু সত্যিই আছে বা এমন কিছু থাকা সম্ভব'। ঠিক এমনই মতামত জানিয়েছেন ৪৫% ইটালিয়ান, ৫৫% স্প্যানিশ এবং প্রায় ৭৮% নাইজেরিয়ান।

একথা সত্য যে, QAnon-ই[২] প্রথম ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হাযির করেনি, বরং এধরনের তত্ত্ব হাজার বছর ধরে বিরাজ করছে। উপরন্তু এসব তত্ত্বের কোন কোনটা তো বিশ্ব ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাবও ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ নাৎসিবাদের কথা বলা যেতে পারে। নাৎসিবাদকে সাধারণত কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসাবে দেখা হয় না। কারণ এটা যেহেতু একটা গোটা দেশের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। তাই আমরা এটাকে সাধারণভাবে একটা ভাবাদর্শই (Ideology) মনে করি, যদিও সেটি মন্দ।

এদিকে নাৎসিবাদও (Nazism) আবার গড়ে উঠেছে এন্টি সেমিটিক[৩] (ইহুদি-বিরোধী) একটি মিথ্যা তত্ত্বের উপর ভর করে। তত্ত্বটি হ'ল, 'আড়ালে থাকা একদল ইহুদি ধনকুবের বিশ্বটা চালায় আর আর্য জাতিকে তারা বিনাশ করতে চায়। তারাই রুশ বিপব ঘটিয়েছে; পশ্চিমা গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে; গণমাধ্যম আর ব্যাংকব্যবস্থা ওদেরই কব্জায়। একমাত্র হিটলারই ওদের ষড়যন্ত্র ধরতে পেরেছেন। আর কেবল তিনিই পারেন ওদেরকে প্রতিহত করে মানবতাকে রক্ষা করতে। এসব তত্ত্বের কমন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে কেন এগুলো এত আকর্ষণীয় ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও।

কাঠামো :

এসব তত্ত্ব বলে থাকে, একটি গুপ্ত সঙ্ঘ বহু কিছু ঘটাচ্ছে যদিও আমরা সেসবের যৎসামান্যই জানতে পারছি। অবশ্য এই সঙ্ঘের পরিচয় একেকজনের কাছে একেক রকম। যেমন, কারো কারো ধারণা, পৃথিবীটা চালায় ফ্রিম্যাসন, ডাকিনীবিদ (witch), বা শয়তানি সঙ্ঘ (Satanists)। আবার কারো মতে, এরা হ'ল এলিয়েন বা মানুষরূপী একধরনের সরীসৃপ বা এধরনেরই কোনো গোষ্ঠী।

সঙ্ঘের পরিচয়ে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও, সবার মূল বক্তব্য কিন্তু একইরকম। আর তা হ'ল: আমাদের চারপাশে ঘটে চলা প্রায় সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে সবার অলক্ষ্যে থাকা একটি গোপন সংগঠন।

মজার ব্যাপার হ'ল, এসব তত্ত্ব খুব সহজে পরস্পর বিরোধী আদর্শকে এক মঞ্চে হাযির করতে পারে। যেমন নাৎসিবাদ দাবি করে, 'আপাতদৃষ্টিতে কমিউনিজম আর পুঁজিবাদকে চরম বিরোধী বলে মনে হয়, তাই না?-- ভুল। আসলে ইহুদি চক্রটি আমাদের কাছ থেকে এমন ভাবনাই আশা করে। এমনিভাবে আপনারা হয়ত মনে করেন যে, বুশ পরিবার[৪]

---

১. এই তত্ত্ব মতে, একটি গুপ্ত সঙ্ঘ সারা পৃথিবীকে কব্জা করে রেখেছে।

২. একটি উগ্র-ডানপন্থী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। তাদের মতে, শয়তান-পূজারী শিশুকামীদের একটি চক্র বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধপল্লীতে শিশুদের পাচার করছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে যিনি কিনা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।।

৩. ইহুদি জাতির প্রতি বিদ্বেষ।

৪. এই পরিবার থেকে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে জর্জ ডবিউ এইচ বুশ আমেরিকার ৪১তম প্রেসিডেন্ট (১৯৮৯-১৯৯৩) নির্বাচিত হন। এবং

আর ক্লিনটন পরিবার[৫] বোধহয় আজন্ম শত্রু। কিন্তু সত্য হ'ল, তারা আসলে নাটক মঞ্চস্থ করছে। আর ভিতরে ভিতরে ঠিকই একই পার্টিতে গিয়ে মাস্তি করছে।

এসব দাবি থেকে আরো একটি তত্ত্ব বেরিয়ে আসে। তা হ'ল, গণমাধ্যমে প্রচারিত খবরের মাধ্যমে আমাদেরকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু যেসব বিশ্বনেতাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, তারা আসলে প্রকৃত ক্ষমতাবানদের হাতের পুতুল।

কেন এত আকর্ষণীয়?

ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোর সুবিধা হ'ল, এগুলো বহু মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। কারণ, এগুলো আমাদের চারপাশে ঘটে চলা অসংখ্য জটিল ঘটনার খুব সরল ব্যাখা দিতে পারে। যুদ্ধ, সহিংসতা, দারিদ্র্য আর মহামারীর প্রকোপে আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি যদি বিশেষ কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাস করে থাকি, তাহলে আমার পরম আনন্দ হয় এটা ভেবে যে, আমি সব জানি।

সিরিয়ার যুদ্ধ? ওখানে আসলে কী হচ্ছে তা বুঝার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস জানবার কোনো দরকার নেই। কারণ এটা হ'ল সেই বিরাট ষড়যন্ত্রের অংশ। ৫-এ প্রযুক্তির উদ্ভাবন? (এটা বুঝার জন্য) ফিজিক্স অব রেডিও ওয়েভস নিয়ে গবেষণা করার দরকার নেই। কারণ এটা হচ্ছে ষড়যন্ত্র। করোনা মহামারী, বাস্তুসংস্থান, বাদুর বা ভাইরাসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা নিঃসন্দেহে সেই ষড়যন্ত্রের অংশ।

এভাবেই এক কল্পিত ষড়যন্ত্রের চাবি দিয়ে বিশ্বের সব রহস্যের দ্বার উন্মোচন করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এটা আমাকে সেই সীমিতসংখ্যক মানুষের দলভুক্ত করে যারা কিনা সমঝদার! ফলে আমি হয়ে যায় আর দশজন মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ! এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এটা আমাকে শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক বা রাজনীতিবিদের মতো সমাজের বুদ্ধিজীবী আর অভিজাত শ্রেণীরও উর্ধ্বে জায়গা করে দেয়। কারণ, তাদের চোখ যা এড়িয়ে যায় বা তারা যা লুকোতে চায়-- আমি সেসবও দেখতে পাই!

এ তত্ত্বের অসারতা কোথায়?

এসব তত্ত্বের বেশ কিছু মৌলিক ত্রুটি আছে। যেমন এগুলোর মতে, ইতিহাস একদম সরল পথে চলে। এ তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দাবি হ'ল, বিশ্বের ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সোজা। কারণ, যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত বিপ্লব বা মহামারী পর্যন্ত সবকিছু হাতে গোনা কিছু লোক আগে থেকেই জানে এবং তারা সেটাকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে।

এমনিভাবে দাবাবোর্ডের সব ঘুঁটি ঐ চক্রটিই নাড়াচাড়া করে। যেহেতু তারাই ভাইরাস সৃষ্টি করে, তাই তারা বলে দিতে পারে, এটি কীভাবে সারাবিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করবে বা পরের বছর অর্থনীতিতে এটা কেমন প্রভাব ফেলবে। তারা রাজনৈতিক সহিংসতা উস্কে দিতে পারে আবার চাইলে তা নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। তারা যুদ্ধ বাধাতে পারে আবার থামাতেও পারে।

কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, পৃথিবীটা এর চেয়েও অনেক বেশি জটিল। উদাহরণ হিসাবে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের

পরবর্তীতে তারই পুত্র জর্জ ডবিউ বুশ আমেরিকার ৪৩তম প্রেসিডেন্ট (২০০১-২০০৯) নির্বাচিত হন।

৫. ক্লিনটন পরিবার-- এই পরিবার থেকেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হয়ে বিল ক্লিনটন আমেরিকার ৪২তম প্রেসিডেন্ট (১৯৯৩-২০০১) নির্বাচিত হন। এবং পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী হিলারি ক্লিনটন আমেরিকার ৬৭তম রাষ্ট্রসচিব (২০০৯-২০১৩) নিযুক্ত হন।

কথাই ধরুন। গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূল করার পাশাপাশি সাদ্দাম যুগের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ২০০৩ সালে তৎকালীন বিশ্বপরাশক্তি আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করল। সেসময় কারো কারো সন্দেহ হয়েছিল, পরাশক্তিটি হয়ত পরবর্তীতে অঞ্চলটির উপর ছড়ি ঘুরাবে আর ইরাকী তেলক্ষেত্রগুলো দখল করে নেবে। যাইহোক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য আমেরিকা এবার বিশ্বসেরা সৈন্য মোতায়েন করল আর কোটি কোটি ডলার ঢালতে লাগলো।

এবার কয়েক বছর পরের দৃশ্য কল্পনা করুন। এতসব তদবিরের ফলাফল কী দাঁড়ালো? চরম ব্যর্থতা। কারণ, সেখানে কোনো গণবিধ্বংসী অস্ত্র পাওয়া যায়নি, উপরন্তু দেশটিতে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। সত্যিকার অর্থে, এ যুদ্ধের বিজেতা ছিল ইরান। কারণ, ইরানই তখন অঞ্চলটিতে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল!

তাহলে আমরা কি এখন এই বলে উপসংহার টানবো যে জর্জ ডবিউ বুশ[৬] এবং ডোনাল্ড রামসফিল্ড[৭] আসলে ছিলেন ইরানের এজেন্ট এবং তারা মূলত ইরানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন? কখনোই না। বরং উপসংহার হওয়া উচিত, মানুষের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা বা তা নিয়ন্ত্রণ করা অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন।

এই বিষয়টা বুঝার জন্য আপনাকে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ আক্রমণ করতে হবে না। বরং আপনি যদি কোনো স্কুল কমিটিতে বা এলাকার কোনো সংগঠনে দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাহলে আপনি হয়ত ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন যে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা কত কঠিন! আপনি হয়ত কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন, অথচ ফলাফল দাঁড়ালো উল্টো! আপনি হয়ত কোনো কিছু গোপন রাখতে চাচ্ছেন, অথচ পরদিন দেখলেন সবাই সেটা নিয়েই কথা বলছে। আপনি আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে মিলে একটা পরিকল্পনা করলেন, অথচ দেখা গেল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সেই আপনার পিঠে ছুরি চালালো।

(বাস্তবতার বিপরীতে) বিশ্ব ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো আমাদের বিশ্বাস করতে বলে যে, ১০০০ বা সামান্য ১০০ মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা বা তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেখানে কঠিন, সেখানে নাকি প্রায় ৮০০ কোটির পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সহজ (?)।

বাস্তবতা

পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র বিদ্যমান। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা, চার্চ, দল বা সরকার প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র রকমের ফন্দি আঁটছে আর তা বাস্তবায়নের সুযোগ খুঁজছে। তবে সমগ্র পৃথিবীকে কব্জা করা বা তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা অত্যন্ত কঠিন।

একথা সত্য যে, ১৯৩০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল এবং (এর বিপরীতে) পুঁজিবাদী ব্যাংকগুলো নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করছিল। রুজভেল্ট প্রশাসন চাচ্ছিল নিউ ডিল[৮] অনুযায়ী আমেরিকান সমাজকে ঢেলে সাজাতে। আর ইহুদিবাদি আন্দোলনটি তখন ফিলিস্তীনে তাদের স্বদেশ গড়ার পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছিল। এগুলো এবং এগুলোর মতো আরো অসংখ্য পরিকল্পনা প্রায়ই পরস্পর বিরোধী হয়। তাই একক কোনো চক্র থাকা সম্ভব নয় যারা কিনা সব ব্যাপারে কলকাঠি নাড়ে।

হতে পারে এই মুহূর্তেও আপনি নানা চক্রান্তের শিকার। আপনারই সহকর্মী হয়ত আপনার বসকে আপনার বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। হয়ত প্রভাবশালী কোনো ওষুধ কোম্পানি আপনার শরীরে ক্ষতিকর ড্রাগ প্রয়োগ করার জন্য আপনার ডাক্তারকে ঘুষ দিচ্ছে। হতে পারে কোনো গোষ্ঠী পরিবেশ-সংরক্ষণ-আইন বাতিল করার জন্য নীতিনির্ধারকদের চাপ দিচ্ছে এবং এভাবে তারা পরিবেশ দূষিত করার সুযোগ খুঁজছে। হয়ত কোনো রাজনৈতিক দল আপনার নির্বাচনী এলাকায় অসদুপায় অবলম্বনের ফন্দি আঁটছে। কোন বিদেশী সরকার হয়ত আপনার দেশে জঙ্গীবাদ উস্কে দিচ্ছে। উপরের সবগুলো ষড়যন্ত্রই বাস্তব হতে পারে, কিন্তু এগুলো কোনোভাবেই একটি সামগ্রিক ষড়যন্ত্রের অংশ নয়।

কখনো কখনো একটি গোষ্ঠী বা একটি রাজনৈতিক দল বিশ্ব-ক্ষমতাধরদের একটি বড় অংশকে হাত করতে পারে। তবে এমন ঘটনা ঘটলে তা ধামাচাপা দেওয়া পুরোপুরি অসম্ভব। কারণ ক্ষমতাধরদের কারণে বিষয়টির ব্যাপক প্রচার হয়।

আসলে বহু ক্ষেত্রে বড় ধরনের শক্তি অর্জনের পূর্বশর্তই হ'ল ব্যাপক প্রচারণা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, জনগণের আড়ালে থাকলে লেনিন কখনো রাশিয়ার ক্ষমতায় আসতে পারতেন না। স্ট্যালিনের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, তিনি প্রথম প্রথম আড়ালে থেকে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের একক ক্ষমতাধর পরিণত হওয়ার আগে দেখা গেল যে রাশিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত আর বাসাবাড়িতে তার ছবি ঝুলছে। স্ট্যালিনের টিকে থাকার মূলে ছিল তার এই ব্যক্তিত্বের কারিশমা। এক্ষণে (কেউ যদি দাবি করে) লেনিন এবং স্ট্যালিন ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতাধরদের হাতের পুতুল মাত্র তাহলে তার এই দাবি সব ঐতিহাসিক দলীলের বিরুদ্ধে যাবে।

কোনো গুপ্ত সঙ্ঘের পক্ষে যে গোটা পৃথিবীটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিটুকু যে কেবল যথার্থ তা-ই নয়, বরং এটা আপনাকে ক্ষমতাবানও করে তোলে। কারণ, (এই উপলব্ধির ফলে) পৃথিবীতে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোর মাঝে আপনি পার্থক্য করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী সমমনা দলগুলোর সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। আর এটাই হ'ল আসল রাজনীতি।

---

৬. তার নেতৃত্বে আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে।

৭. তিনি সেসময় মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব ছিলেন।

৮. নিউ ডিল (New Deal) মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আমলে নেওয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচী।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান

*[দেশের একজন কৃতি সন্তান তদানীন্তন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সদস্য অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান (৮৬)। তাঁর সংগ্রামী জীবনেতিহাস নিয়ে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাকের নির্বাহী সম্পাদক **মুখতারুল ইসলাম**]।*

তাওহীদের ডাক : আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আমীরে জামা'আত কেমন আছেন?

তাওহীদের ডাক : আলহামদুলিল্লাহ, আমীরে জামা'আত ভালো আছেন। প্রথমেই আপনার জন্ম সাল ও জন্মস্থানের ব্যাপারে জানতে চাই।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : আমার জন্ম সেই ব্রিটিশ বাংলায়। আমার সার্টিফিকেটে ১৯৪০ জন্মসাল হিসাবে দেওয়া আছে। আমার জন্ম মূলতঃ ১৯৩৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর। গ্রামের বাড়ি গোবিন্দগঞ্জের ফুলবাড়িতে, যা আমার বর্তমান বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-রংপুর রোডের উপরে কাটাখালী ব্রীজ সংলগ্ন। প্রাচীন ফুলবাড়ি গ্রামটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসরতা। যে সময় গ্রামে সাধারণত নাম স্বাক্ষর করা লোক ছিল খুবই বিরল। অথচ তদানীন্তনকালে আমাদের গ্রামে শিক্ষিত লোক ছিল অনেক। তার বড় সাক্ষী হ'ল দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর একটি ছিল প্রাইমারী স্তরের মাদরাসা এবং আরেকটি হাইস্কুল। পড়াশোনার আকালের যুগে এটা সত্যই খুবই অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হ'ল আমার গ্রামে অন্য ধর্ম তো দূরের কথা, কোনদিন অন্য মাযহাবের লোকেরও বসবাস ছিল না। পুরোটাই ছিল আহলেহাদীছের বসবাস। আমার আব্বা বলতেন, তাঁর দাদার পূর্বপুরুষেরাও আহলেহাদীছ ছিলেন। বর্তমানে ফুলবাড়ি গ্রামে দুইটা আহলেহাদীছ মসজিদ আছে। তন্মধ্যে একটা মসজিদ আমীরে জামা'আতের করা। আর আরেকটা দেড়শত বছরের পুরাতন ব্রিটিশ আমলের মসজিদ।

তাওহীদের ডাক : আপনার পিতার পেশা বা জীবনবৃত্তান্ত যদি কিছু আমাদের শুনাতেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : আমার আব্বা তাঁর সামান্য কৃষি জমি ছিল, যাতে তিনি আবাদ করতেন। পিতার পরিবার ছিল বড়। তাঁরা ছিলেন ছয়-ভাইবোন। আব্বা ছিলেন সবার বড়। ১৯১৭ সালে আব্বা যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী, তখন দাদা মারা যান। ফলে তাঁর পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে ১৯১৮ সালে পরীক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হননি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আব্বাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমি তখন মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম। পাকিস্তানী আর্মি একদিন আমাকে ধরার জন্য বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করে এবং আব্বাকে বলে, 'আপকা ব্যাটা কো হামারে পাস ভেজ দো'। আমি তখন পাবনায় ছিলাম। তাই আমাকে না পাওয়ায় তারা আব্বাকে ধরে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৭ই মে বগুড়ায় ওয়াপদা ক্যাম্পে নিয়ে আরো অনেকের সাথে তারা আব্বাকেও হত্যা করে। শুধু তাই নয়, আব্বার সাথে আমার এক ভাতিজাকেও হত্যা করা হয়। ছেলেটা খুবই মেধাবী ছিল। হাইস্কুল থেকে সেই সময় ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিল এবং একটি চাকুরীও পেয়েছিল। তাদের লাশগুলো পর্যন্ত আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। কোথায় তাদের লাশ ফেলা হয়েছিল, তাও কোনদিন জানতে পারিনি। আমার সারা জীবনের দুঃখ পিতা ও ভাতিজার এই মর্মান্তিক মৃত্যু।

তাওহীদের ডাক : আপনার আম্মা, ভাই-বোন?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : আমরা ২ ভাই ২ বোন। আমার মা মোছাম্মাৎ ছাবেরুন্নেছা। আমার নানার নাম ছিল মুহাম্মাদ আছমতুল্লাহ মুনশী। আমার ছয় বছর বয়সে আমার নানা মারা যান। আমার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান আমার বড় ভাই আজমাল হোসাইন আইএসসি পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা বোর্ডে থার্ড স্ট্যাণ্ড করেছিল। কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার তিন/চার দিন আগে সার্স রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৮ সালে মারা যায়। প্রথম সন্তান মারা যাওয়ার ফলে আমার বাবা ও মা খুবই কষ্ট পান। এমনকি আমার প্রাণপ্রিয় জননী পুত্র হারানোর বেদনা সহ্য করতে না পেরে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুস্থ হ'তে পারেননি। আমার বোন বড় ভাইয়ের পাঁচ বছরের ছোট আর আমি আমার বড় ভাইয়ের এগারো বছরের ছোট ছিলাম।

তাওহীদের ডাক : আপনার পড়াশোনা ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে যদি কিছু আমাদের জানাতেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : ফুলবাড়ি ইউনিয়ন নাছির উদ্দীন জুনিয়র মাদরাসায় আমার ছাত্রজীবন শুরু। আমি নির্দিষ্ট বয়সের বেশ পরে নয় বছর বয়সে ভর্তি হই। কেননা আমার বয়স যখন ছয়, তখন থেকে নয় বছর পর্যন্ত আমি কালা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলাম। ফলে তিন বছর সময় নষ্ট হয়ে গেছে। মাদরাসায় আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করি। পরে আমি ১৯৫২ সালে গোবিন্দগঞ্জ হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হই। আমার ছাত্রজীবন খুব ভালো কেটেছে। ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হতাম। জীবনে কখনো সেকেণ্ড হয়েছি বলে মনে পড়ে না। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেই। এরপরে জুলাই মাসে রংপুর কারমাইকেল কলেজে

ভর্তি হই। তদানীন্তনকালে রংপুরে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ছিল না। বাড়িতে বের হয়ে রংপুর পৌঁছতে তিনদিন সময় লেগে যেত। তারপর কারমাইকেল থেকে আমি এইচএসসি পাশ করি ১৯৫৮ সালে। এইচএসসি পাশ করার পর আমার লেখাপড়া সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

তাওহীদের ডাক : পড়াশোনায় ইতি টেনে কি আপনি কর্মজীবনে পা রেখেছিলেন?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : হ্যাঁ, ইন্টার পাশ করে আমাকে বসে থাকতে হয়নি। তবে আমার জীবনটা বেশ বৈচিত্র্যময়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে আমি বেশ অনেকগুলো চাকুরী করেছি।

ইন্টার পাশ করার পরপরই যোগ দেই পাকিস্তান এয়ার ফোর্সে। একবার সেখানে আমার পাকিস্তানী কমাণ্ডিং অফিসারের সাথে বাদানুবাদ হ'ল। কোন কারণ ছাড়াই সে আমাকে ভীষণ গালাগালি করল। সে আমাকে বাঙ্গালী হিসাবে ঘৃণাভরে বিশ্রী গালি দিয়ে বলে ফেলল, 'বাইঞ্চোদ! তুঝে উর্দূ কিউ নেহি আতী?' এই কথাতে আমি খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। দিনটা ছিল শুক্রবার সকাল। আমি তাকে বললাম, 'সামভালকে বাত কিয়ে, তু জানতে হ্যায় ম্যায় কোন হুঁ? তু এক হাবিলদার হ্যায় আওর ম্যাঁয় এক পাইলট হুঁ!

উর্ধ্বতন অফিসারের মুখের উপরে এই কথা বলার পর সে আমার বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দিল। এতটুকু অপরাধেই কোর্ট মার্শালে সামরিক শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে আমার বিচারের রায় হ'ল মৃত্যুদণ্ড। তখন আইয়ুব খানের আমল। দেশে 'মার্শাল ল' চলছে। রাষ্ট্রপতির প্রধান আইন প্রশাসক এমএজি ওসমানী সাহেব (পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক) তখন ওখানে ছিলেন। এছাড়াও সহযোগিতা করেছিল আমার এক বন্ধু যিয়াউল হক। একই সঙ্গে আমরা দু'জনই চাকুরীতে যোগদান করেছিলাম। ট্রেনিং-য়ে আমরা ছয়জন জিডি পাইলট হওয়ায় পূর্ব পাকিস্থানের স্পেশাল ব্যাচে চান্স পেয়েছিলাম। বন্ধু যিয়াউল হকের বাড়ি হ'ল বগুড়ার দুপচাঁচিয়া থানায়। সে ১৯৭০ সালে পাবনায় মারা যায়। ওর পিতা ছিলেন জসীমুদ্দীন ছাহেব, তিনি তাঁর ছেলে মারা যাওয়ার পর আমাকে নিজের ছেলে মনে করতেন। যাইহোক আমার যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, তখন ওসমানী ছাহেবের প্রচেষ্টায় এক দরখাস্ত লিখে আমাকে সই করতে বলা হয়, যেখানে লেখা ছিল যে, আমি আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি। এটা দেখে আমি তাদের বলেছিলাম, নাহ! প্রাণভিক্ষা কোন মানুষের নিকট চাওয়া যায় না; শুধু চাওয়া যায় আল্লাহ্‌র কাছে। ছোটকাল থেকেই আমি একটু ঘাড় ত্যাড়া স্বভাবের ছিলাম। সত্য জিনিসকে আমি সবসময় সত্যই মনে করতাম। তাতে প্রাণ যায় যাক। শুধু তাই নয়, আমি এমন ছিলাম যে, সহজে কারও অসত্য মতামত গ্রহণ করতাম না। ওসমানী ছাহেব আমার এ আচরণে একটু রেগে গিয়েছিলেন। আসলে বাঙ্গালী ভাই হিসাবে এটা ছিল তাঁর একান্ত অনুকম্পা। আমি তাঁকে বললাম, দেখেন আমার নছীবে যদি মৃত্যু থাকে, তাহ'লে আপনি তা কোনদিনই ঠেকাতে পারবেন না। আমি আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

তিনি বললেন, তুমি যদি প্রাণভিক্ষা চাইতে না পারো, তাহ'লে তুমি নিজেই লেখ কি লিখবে? তখন আমি আমার বন্ধু যিয়াউল হকের সহযোগিতায় লিখলাম যে, আমি ছোট অপরাধ করেছি। কিন্তু অন্যায়ভাবে আমাকে গুরুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক। পিতাকে না জানিয়ে আমি এয়ার ফোর্সে এসেছি। আমি অন্যায় করেছি। মনে হয় সেটাই আমার পাপ। সেই পাপে আমার শাস্তি হচ্ছে। তাছাড়া আমি আমার ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলেছি। আমি বড় কোন অপরাধ করিনি। উনি আমাকে বলেছেন, উর্দূ জানো না কেন? বাংলা আমার মাতৃভাষা, আমাকে উর্দূ জানতে হবে কেন? শুধু তা-ই নয়, তাকে আমি বলেছিলাম পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের ভাষা বাংলা আর বাকীরা হ'ল উর্দূভাষী। তার মধ্যে আমি নতুন। তার কথাই ভালো করে বুঝতে পারিনি'। এই চিঠি লেখার পর আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থগিত করেন মান্যবর আইয়ুব খান। আমার মনে আছে, সেদিন সোমবার সকাল ১১-টায় আমার বন্ধু আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোর উদ্দেশ্যটা ভালো, তোকে ক্ষমা করা হয়েছে।

এই ঘটনার পর আমি দেশে ফিরে আসি। কিন্তু পাকিস্তান সরকার একটা শর্ত জুড়ে দেয় যে, সেনাবাহিনীতে আমি আর কখনো চাকুরী করতে পারব না। তারপর দেখি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নতুন ৬২টি থানায় এডিশনাল এসপি পদে পুলিশে লোক নিচ্ছে। ফলে সেখানে দরখাস্ত করি। সেখানে এক বছর ছয় মাস ট্রেনিং করার পর আমার চাকরী হ'ল। কিন্তু আমার চাকুরী তিন মাস পূর্ণ হ'তে না হ'তেই একটা ধর্ষণের মামলা আমার হাতে এসে পড়ল। সেই কেসে একজন পুলিশ অফিসারও জড়িত ছিল। আমি সেই ভিকটিম মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু আমি মেয়ের বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে, যেভাবে হোক আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমার মেয়েকে উদ্ধার করবো। তিনদিন পর মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল উল্লাপাড়া রেলস্টেশনের ধারে। তখন আমি মনের ক্ষোভে পুলিশের চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি চলে আসি। সময়টা ১৯৫৮-১৯৬০-এর মধ্যে হবে। তো সেখান থেকে চলে এসে বাড়ি বসে আছি। বন্ধু-বান্ধবরা সবাই বলল, তুই একটা আহাম্মক। এত বড় চাকরী তুই ছেড়ে দিলি। তুই পরবর্তীতে আইজি বা ডিআইজি হতিস। আমার পিতাকে আমি 'বাজান' বলে ডাকতাম। বাজান বলল, তুমি ভালো কাজ করেছো। লেখাপড়া শিখে পুলিশ হবে তা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। যেই আল্লাহ মুখ দিয়েছেন, সেই আল্লাহ খাবার দিবেন।

তারপর দেখলাম সমবায় বিভাগে লোক নিচ্ছে থানার সহকারী অফিসার পদে। দরখাস্ত করলাম। বেতন খুব কম, মাত্র ১১০ টাকা। ১৯৬০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণের জন্য ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ কলেজে ভর্তি হ'লাম

ঢাকার ধানমন্ডিতে গ্রীণ রোডে। এই কলেজে আমিই প্রথম পা রাখি। ১২০ জন ছাত্রের মধ্যে আমি প্রথম ছাত্র আমাদের ব্যাচে। আমাকে দিয়ে ক্লাস উদ্বোধন করা হয়। তখন গভর্ণর ছিলেন আযম খান (১৯৬০-৬২)।

সেখানে এক বছর ট্রেনিং-য়ে ৬ মাসের থিয়োরেটিক্যাল ও ৬ মাসের প্র্যাকটিক্যাল শেষ করে ১৯৬১ সালের ১৫ই আগস্ট নিয়োগ পেয়ে ১৬ই আগস্টে রংপুর যেলায় যোগদান করলাম। সেখান থেকে আমাকে পোস্টিং দেওয়া হ'ল ডিমলায়। চাকুরীর সুবাদে প্রথম ডিমলার সাথে আমি পরিচিত হলাম। অথচ ইতিপূর্বে এর নামও কোনদিন শুনিনি। তখনকার বৃহত্তর রংপুর যেলার সর্বশেষ বর্ডার থানা হ'ল ডিমলা। আর ডিমলায় সেসময় কুষ্ঠ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ভয়ে লোক সেখানে যেত না। আমি বরাবরই অ্যাডভেঞ্চারাস স্বভাবের লোক ছিলাম। আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার সেখানে ছিলেন এম মুযাক্কির ছাহেব। সিলেটের মানুষ। আমাকে বললেন, ডিমলায় তোমাকে পোস্টিং দিল আর তুমি চলে এলে? বললাম, কি করবো স্যার পোস্টিং দিয়েছে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চলে এসেছি। আমি ডিমলা থেকে বদলী হয়ে জলঢাকা থেকে আবার বদলি হয়ে গোবিন্দগঞ্জ চলে আসি। তারপর আমাকে আবার পোস্টিং দেওয়া হল ডোমারে। ১৯৬৫ সালের ৩১শে মার্চ আমি ডোমারেই বিয়ে করি।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে আমার প্রমোশন হ'ল মিনিট কোটায়। ২৪৬ জনকে ডিঙ্গিয়ে আমাকে প্রমোশন দেওয়া হ'ল বগুড়া সদরে। আমাকে মহকুমা অফিসার পর্যায়ের সম্মান দেওয়া হ'ল। এখানে আমি ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত থাকি। এরপর আমাকে পোস্টিং দেওয়া হয় পাবনায়। পাবনায় গুরুদায়িত্ব ছিল গ্রামীণ ঋণ প্রদান করা। আমার ৩২টা দায়িত্বের মধ্যে প্রথম দায়িত্ব ছিল সময়মত অনাদায়ী ঋণ আদায় করা। আমি কৃতিত্বের সাথে এই দায়িত্ব পালন করেছিলাম। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমার বস পালিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। ফলে সব দায়-দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়ল।

তাওহীদের ডাক : আপনি এদেশের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের শুরুটা কেমন ছিল?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : পাবনায় আমার অফিস প্রধান ছিলেন নূরুল হক ছাহেব নোয়াখালীর লোক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হ'লে তিনি পালিয়েছিলেন। অবশেষে ডিসি নূরুল কাদের খান (কুমিল্লা)-কে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেমে পড়লাম। তিনি তার নামের শেষে 'খান' কথাটা বাদ দিলেন। কেননা পাকিস্তানীদের নামের শেষে 'খান' ব্যবহার হতো। এভাবে আমরা পাবনা, নগরবাড়ী, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করেছি। অবশেষে দেশ স্বাধীন হ'ল।

তাওহীদের ডাক : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিশেষ কোন স্মৃতি যদি আমাদের শোনাতেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অনেকের মধ্যে আমি যে কাপুরুষতা দেখেছি, তা খুবই লজ্জার। বিশেষ করে আমার যেলা অফিসার শাহ আখতারুযযামান ছাহেবের কথা বলতে হয়। তাঁর বাড়ি জামালপুর। উনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার ভাবগতিক দেখে পালিয়েছিলেন। যাইহোক যুদ্ধ শুরু হ'ল। প্রথমেই আমরা পাবনায় যুদ্ধ করি এবং সফল হই। বিশেষতঃ নগরবাড়ীর যুদ্ধের কথা আমার মনে পড়ে। একবার রাত আড়াইটায় একজন মেজরের অধীনে ১৫০ জন পাকিস্তান আর্মি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের দলে একজন কুখ্যাত ডাকাত টিপু বিশ্বাস ছিল। প্রথমে তাকে কেউ আমাদের সাথে নিতে চাচ্ছিল না। আমি সবার মাঝে সমন্বয় করে তাকে মুক্তিযুদ্ধে শরীক করি। আমি সকলকে বুঝালাম যে, এখন বাঙ্গালী সকলে ভাই ভাই। ভালো মানুষ আর চোর-ডাকাতের ভেদাভেদ আমরা করব না। পাক আর্মিদের অতর্কিত আক্রমণে সবাই আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। অবশেষে সেই কুখ্যাত টিপু বিশ্বাসই সেদিন তার নিজের তৈরী হাত বোমা দিয়ে পাকিস্তানী আর্মিকে কুপোকাত করেছিল। পরে তার সাহসী পদক্ষেপেই আমরা সেদিনের যুদ্ধে জয় পেয়েছিলাম। সেই যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে আমার মাথায় আঘাতের চিহ্ন এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি।

তাওহীদের ডাক : দেশে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে আপনার চাকুরী ছিল, নাকি অন্য কোন পেশায় জড়িয়ে পড়েছিলেন?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : মুক্তিযুদ্ধের পর আমি চাকুরী থেকে রিটায়ার করেছিলাম। খুলনার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা আইয়ুব আলী আমাকে মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে ডেকে নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন উনার সাথে আমার অন্ত রঙ্গতা ছিল। আমি সেখানে মুক্তিযুদ্ধের জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে কাজ শুরু করি।

তাওহীদের ডাক : মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশকে আপনি কেমন দেখেছেন? যে প্রত্যাশা নিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন, তার প্রাপ্তি কতটুকু?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ বিষয়ে কি আর বলব! বড় দুঃখ হয়। যাইহোক দু'টি ঘটনা বলি-

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। উনি আমার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনারা কি ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য নিচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের স্বাধীনতার দরকার আছে। আমাদেরকে বিশ্ব দেখবে। আমি বললাম, আপনার মত পাগল আর কেউ নেই। আপনি সাহায্য নিন। কিন্তু ইণ্ডিয়ার সাহায্য নেবেন কেন? একবার আমরা পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে দেখেছি। ইণ্ডিয়া আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তিনদিকে ইণ্ডিয়া আর একপাশে বঙ্গোপসাগর। ইণ্ডিয়া আমাদের সাথে পাকিস্তানীদের মত

গাদ্দারী করলে সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের থাকবে না। আর সাহায্য যদি নিতে হয় তাহ'লে রাশিয়ার কাছ থেকে অথবা চীনের কাছ থেকে নিন। আমি বলছি এ জন্য যে, আমাদের গ্রামে একটা কথা আছে, 'গরীবের সুন্দরী বউ সবার ভাবী'। সুতরাং ইণ্ডিয়া এখন বন্ধুত্ব দেখাবে, সাহায্য করবে বটে; কিন্তু ভবিষ্যতে তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। আজও ইণ্ডিয়ার সাহায্য নেয়ার মাশূল আমাদের দিতে হচ্ছে তাদের গোলামী করে।

২. বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, অন্ধকার ঘরে সাপ, মানে সারা ঘরেই সাপ। এই কথাটি আমি নিজেই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম।

১৯৭৩ সালের ২৪শে আগস্ট সকাল ৯টায় আমরা এ্যারোফ্লোটের একটি ফ্লাইটে রাশিয়ার মস্কোতে যাচ্ছিলাম। তার পূর্বে ২৩শে আগস্ট আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা ও দো'আ নিতে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরীর প্রস্তুতি চলছে। আমার কাছে বিষয়টা যেন কেমন ঠেকল। কারণ আমার মনে হ'ল প্রথমে রাজাকারদের তালিকা হওয়া দরকার। আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে অনুমতি চেয়ে বললাম, আমি কি আপনাকে সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করতে পারি? তিনি বললেন, তুমি সৎসাহস নিয়ে যা ইচ্ছা আমাকে বল। আমি বললাম, মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরী না করে, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের তালিকা তৈরী করা উচিত। তিনি বললেন, কেন? মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই অসহায় অবস্থায় আছে, তালিকা না হলে কিভাবে তাদের সাহায্য করব? আমি বললাম, ওটা তো খুব সহজ। আমাদের সমাজকল্যাণ ও সমবায় বিভাগ এটা করবে। তাকে আমি উপরের প্রবাদটা শুনালাম এবং বললাম তা না হলে অনেক রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নাম লিখাবে'। তিনি আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন। আমার মনে হয় উনি জীবিত থাকলে আমার কথার বাস্তবতা দেখে যেতে পারতেন। কেননা আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশে সত্যিকারের সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা পাঁচ হাযার বা সাড়ে পাঁচ হাযারের বেশী নয়। কিন্তু এখন প্রায় দুই-আড়াই লাখ সনদ দেওয়া হয়েছে। আরও তিন চার লাখ ওয়েটিং লিষ্টে আছে। সব ভুয়া, সব ভুয়া। ফলে এখন মুক্তিযোদ্ধা নয়, সার্টিফিকেট বাহিনী দেশে গড়ে উঠেছে।

তাওহীদের ডাক : আপনি কি মুক্তিযুদ্ধের কোন সার্টিফিকেট নিয়েছেন?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : না, আমি নেইনি। কারণ সার্টিফিকেটের জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধ করিনি। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কম্যাণ্ড কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী ১৯৯৭ সালে আমার যেলায় এসেছিল এবং আমাকে দরখাস্ত করতে বলেছিল। সে সবার সামনে বলে গিয়েছিল, গাইবান্ধায় কেউ খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা থাকলে নাকি আমিই এক নম্বর। পরে আর কোন খবর নাই। আমি মনে করি আমি মুসলমান। আমার মুসলমানিত্বের জন্য কোন সার্টিফিকেটের দরকার আছে? নিশ্চয়ই নাই। অতএব এগুলোতে আমার কোন যায় আসে না।

আমার কথা না হয় বাদ দিলাম। এতসব সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে প্রখ্যাত কাদের বাহিনী, আমার কমান্ডার অফিসার, কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী স্যার, আইয়ূব আলী খান বাঙ্গালী, নূরুল কাদের খান স্যারেরা পর্যন্ত সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারেননি।

তাওহীদের ডাক : পেশাগত কাজে আপনি রাশিয়া, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। এসব সফরের ব্যাপারে যদি আমাদের কিছু বলতেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : সরকারী কাজে আমি পাঁচটি মহাদেশের ২৩-২৪ টা দেশ ঘুরেছি। সর্বপ্রথম আমি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সরাসরি সিলেকশনে ইকনোমিক ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কো-অপারেটিভে বিশেষ কোর্স করার জন্য রাশিয়ার মস্কোতে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ থেকে পাঁচজনকে তিনি পড়াশোনার জন্য ডিপ্লোমা কোর্সে পাঠিয়েছিলেন। এর পিছনে একটা ইতিহাস আছে যা না বললেই নয়। তৎকালীন সময়ে রংপুর পীরগঞ্জের মতীউর রহমান সরকার পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী আমার দুই বছরের সিনিয়র ছিলেন। উনি আমাকে বললেন, তুমি একজন ভালো মুক্তিযোদ্ধা। তুমি বিদেশ যাও। আমি বললাম, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু বেশকিছু যোগ্য লোককে রাশিয়া পাঠাচ্ছেন উচ্চতর ডিপ্লোমার জন্য। এভাবে আমি রাশিয়াতে গিয়েছিলাম। আর জার্মানিসহ আরো অন্যান্য দেশে সরকারী কাজে যাওয়া হয়েছিল।

তাওহীদের ডাক : বিভিন্ন দেশের কোন বিশেষ স্মৃতি আছে কি?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : স্মৃতি তো অনেক আছে। এখন অনেক কিছু ভুলে গেছি। ইদানিং সব ভুলে যাচ্ছি। রাশিয়াতে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বাড়ি দেখেছি। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় লাইব্রেরী দেখেছি। মহান আল্লাহ নগণ্য বান্দাকে দুনিয়াতে অনেক কিছু দেখার সুযোগ দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পাকিস্তানের পক্ষে মিঃ নিয়াযী এবং বাংলাদেশের পক্ষে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা স্বাক্ষর করলেন। ব্যাপারটা আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : এ বিষয় বলার অনেক আছে। কিন্তু আমি ওসমানী ছাহেবের মুখ থেকে এ বিষয়ে কোন কথা শুনিনি। এগুলো রাজনৈতিক বিষয়। এগুলোর মূল ইতিহাস জানা বেশ দুরূহ। এ বিষয়ে আমি অনেক বক্তব্য শুনেছি, সবটার সাথে আমি একমত নই। তবে মনে করি, এ বিষয়ে

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ছাহেবের সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

তাওহীদের ডাক : আপনি বলেছিলেন, জীবনে ৪/৫ বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মহান আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলতেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : প্রথমতঃ পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ফায়ার স্কোয়াড থেকে আমি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্মুখ সমরে মহান আল্লাহ মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রবল বন্যায় আমি গ্রামের বাড়ি থেকে মটর সাইকেল যোগে ফিরছিলাম। বিশ্বরোডও পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় একটি বাস আমার হোন্ডাকে চাপা দিয়েছিল। গুরুতর আহত হয়েছিলাম। একটি পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, নূরুল ইসলাম প্রধান সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল চিকিৎসার পর মহান আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আবার সুস্থ জীবন লাভ করি। আলহামদুলিল্লাহ।

চতুর্থতঃ ২০১০ সালে ৪ঠা মার্চ চন্ডিপুর মসজিদ কমিটির অনুরোধে খুৎবা দেওয়ার দাওয়াত পাই। তারা বলল, আপনার খুৎবা আমাদের খুব ভালো লাগে। আমি সুন্নাত পড়ে বসে আছি। আমার বুকে হঠাৎ প্রচন্ড ব্যথা। আমার ছেলে বগুড়া জিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত ডাক্তার বললেন, বাড়ি নিয়ে কবর দিয়ে দাও, উনি আর বেঁচে নেই। আমার ছেলে খুব জেদি টাইপের। সে আমাকে ঢাকায় হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে ভর্তি করায়। ২১শে এপ্রিল আমার জ্ঞান ফিরে। আমার এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুর মেয়ে ডা. ফজিলাতুন নেসা অপারেশন করে। অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার সময় আমাকে প্রশ্ন করে, চাচা ভয় পাচ্ছেন? আমি তাকে বললাম, আম্মু আমি কেন ভয় পাব। বরং তোমারই বেশী ভয় পাওয়ার কথা। কেননা রুগী মারা গেলে তোমারই বেশী দুশ্চিন্তা, তাই নয় কি? তখন আমার প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছিল, 'নূরুল ইসলাম ইজ এ লার্জ হার্টেড জেন্টলম্যান'। পরবর্তীতে আমি সুস্থ হয়ে উঠি, আলহামদুলিল্লাহ।

সর্বশেষ ২০২০ সালের মার্চ মাসে আমি তাহাজ্জুদ পড়তে উঠব। তখন আমার স্ট্রোক করে। আমি আর কিছু বলতে পারিনা। আল্লাহ আমাকে আবার হায়াত দারায করেছেন। ফলে তোমাদের সাথে কথা বলতে পারছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি অতীতে কোন আহলেহাদীছ সংগঠনের সাথে পরিচিত ছিলেন কি?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ সংগঠনের সাথে আমাদের পারিবারিক ও সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল। আমি যখন পাবনায় ছিলাম ১৯৫৩ সালে, সেখানে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। আমার বাবাও মাঝে-মধ্যে তাঁর কাছে যেতেন। কেননা তিনি আমার পিতার বন্ধু মানুষ ছিলেন, আর তিনি ছিলেন আমার শিক্ষকের মতো। আমি একবার হযরত আদম (আঃ)-কে দুনিয়াতে পাঠানোর কারণ সম্পর্কে কাফী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হযরত আদম (আঃ)-এর ভুলের কারণে মহান আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যাখ্যার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করলাম। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি এর ব্যাখ্যা কি হবে বলে মনে কর। আমি বললাম, বেহেশতে হ্যাঁ-না শুধু একটাই। আর তা হ'ল গাছের নিকট না যাওয়া। মহান আল্লাহ যেহেতু তাঁকে বিপদসংকুল মাটির দুনিয়ায় পাঠাবেন, সেহেতু তাকে বেহেশতে কিছু শিক্ষা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন'। তিনি আমার মতকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করলেন।

আমি তাকে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আমরা শব্দ ব্যবহার করেছেন কেন? তিনি বললেন, বাবা তুমি কি ইংরেজী জান? আমি বললাম, জী। তিনি বললেন, ইংরেজীতে 'ইউ' মানে তুমি। কিন্তু মহান আল্লাহ্র ক্ষেত্রে আপনি অর্থে ব্যবহার হয়। বিষয়টি আসলে এমনই।

তাওহীদের ডাক : ড. আব্দুল বারী স্যারের সাথে আপনার কোন পরিচয় ছিল?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : জ্বী, তাঁর সাথেও ভালো সম্পর্ক ছিল। সংগঠনের অভ্যন্তরে যখন গোলযোগ হয়, তখন আমি একবার তাঁকে এক সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করেছিলাম। আমি তাঁকে আরাফাত পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার জন্য অনুরোধপত্র লিখতে বলেছিলাম। তিনি বললেন, আপনার প্রস্তাব খুব ভালো। ঠিক আছে বাদ আছর আপনাকে সিদ্ধান্ত জানাব। তারপর দেখি আছর পর মন ভার করে তিনি আমার সামনে হাযির হলেন এবং বললেন, ভাই, এটা সম্ভব নয়। এখন তো উনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর কিছু বলার নেই। আল্লাহ উনাকে মাফ করুন।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে প্রথম কখন, কোথায় আপনার সাক্ষাৎ ঘটে?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেবকে আমি আগে থেকেই চিনতাম এবং তাঁর বক্তব্য ও লেখনী পড়তাম। তবে সরাসরি আমার পরিচয় হয় ১৯৯৮ সালে গাইবান্ধার ফুলবাড়ি মাদ্রাসার মাহফিলে। সেই মাহফিলে আমি সভাপতি ছিলাম। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া অনেক কথা। তবে চাকুরী ছেড়ে অবসরে যাওয়ার পর থেকে দিনে দিনে তাঁর প্রতি আমার মহব্বত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরই হয়েছে। এই মহব্বতের গভীরতা যে কত বেশী তা প্রকাশের সাধ্য আমরা নেই, কেবল তা অনুভবই করতে পারি। আমার সৌভাগ্য যে, আমীরে জামা'আতের আব্বাকেও আমি দেখেছি এবং তাঁকে বহু পূর্ব থেকেই বড় আলেম হিসাবে জানতাম। আমার মনে আছে,

আমার শিক্ষক মাওলানা নযরুল হোসেন এবং আমার আব্বা একবার আল্লামা কাফী ছাহেবের সাথে পাবনায় দেখা করতে গেলেন। সাথে আমিও ছিলাম। আমরা সেখানে কাফী ছাহেবের দফতরে আমীরে জামা'আতের আব্বা মাওলানা আহমাদ আলীকে দেখেছিলাম। এটা আরো নিশ্চিত হলাম কয়েকদিন আগে তাঁর জীবনী পড়ে।

তাওহীদের ডাক : আপনি তো শিকড় সন্ধানী একজন বোদ্ধা পাঠক। আমীরে জামা'আতের বক্তব্য ও লেখনী আপনার কেমন লাগে?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : খুবই ভালো লাগে। খুব মনোযোগ সহকারে তাঁর লেখনী, তাঁর সম্পাদকীয়গুলো পড়ি। কোথাও কোন পরামর্শ দেওয়ার থাকলে আমি স্বল্পজ্ঞানে তাঁকে বলার চেষ্টা করি। আজকে সকালেও তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি জয়পুরহাট যেলা সম্মেলনে বলেন, 'রাষ্ট্রভাষা যদি বাংলা হয়, তাহলে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হবে না কেন?' কথাতে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমি মনে করি তাঁর এ যুক্তি খণ্ডন করার কোন সুযোগ নেই। যদিও আমি একজন যুক্তিবাদী মানুষ। আমি দেশে-বিদেশে অনেক বিতর্ক অনুষ্ঠানে যুক্তি দিয়ে বিজয়ী হয়েছি। বির্তক প্রতিযোগিতায় আমি কোনদিন হারিনি। আমার মনে পড়ে একবার মস্কোতে থাকাকালীন সময়ে 'আল্লাহর অস্তিত্ব আছে কি নেই'-এ বিষয়ে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে আমি বিজয়ী হয়েছিলাম।

তবে সবকিছুর চাইতে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমার নিকট খুব প্রিয়। তাঁর মত মানুষ হয় না। আমি উনাকে ভালোবাসি নিজের চাইতে বেশী। কারণ নির্লোভ ব্যক্তি হিসাবে আমার এই ৮৬ বছরের জীবনে আমি এই একজনকেই পেয়েছি। আর তিনি যে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, মহান আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন!

তাওহীদের ডাক : গোবিন্দগঞ্জ ইসলামী কমপ্লেক্স নিয়ে আপনার স্বপ্ন কি?

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : গোবিন্দগঞ্জ খুব ক্রিটিক্যাল একটা জায়গা। ১৯৯৩ সালে আমীরে জামা'আত এই কমপ্লেক্সটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিরোধীরা হামলা করে মসজিদের ক্ষতি সাধন করেছিল। বর্তমানে আমাদের স্বপ্ন এখানে একটা মসজিদ, মাদরাসা ও মার্কেট হবে, যা সংগঠনের দাওয়াত প্রচার-প্রসারে সহায়ক হবে। বিশেষ করে আমাদের যুবসংঘের কিছু ছেলের কর্মসংস্থানও হবে। আলহামদুলিল্লাহ আমীরে জামা'আত এ বিষয়ে খুবই আন্তরিক। তিনি আমার অন্তিম স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের আশেপাশেই কিছু নামধারী আলেম আছে, যারা শুধু অর্থ ও দুনিয়ার পিছনে ঘুরে। তাদের নাম আমি উল্লেখ করতে চাই না। যাইহোক আমি চাই এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আমার এই স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপ নেবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : আপনার দীর্ঘ জীবনের পথ চলার অভিজ্ঞতা থেকে যুবসমাজের জন্য যদি কিছু নছীহত করতেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : সকলের প্রতি একটাই উপদেশ, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার। তাই যৌবন যার, ন্যায় ও সত্যের পথে লড়াই করার সময় তার।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পত্রিকার পাঠকদের জন্য কিছু বলুন।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : আমি 'যুবসংঘ' ও 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। 'যুবসংঘ'র এই চমৎকার মুখপত্রটিকে মহান আল্লাহ কবুল করুন।-আমীন!

তাওহীদের ডাক : আপনার নেক দো'আ কামনা করি। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য অনেক শুকরিয়া।

মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান : মহান আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখুন। আমি কখনো হায়াত বৃদ্ধির দো'আ চাই না। আমার দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আমার জীবনের ৮৬ বছর কাটিয়েছি। আমি আর হায়াত চাই না। আমি যেন ঈমানের সাথে মরতে পারি, এই বার্তা আমীরে জামা'আতসহ সকল শুভাকাঙ্খীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ রাখছি।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা** : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত

-মাওলানা রাগেব আহসান

[বাংলার কিংবদন্তী আহলেহাদীছ মনীষী মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী ১৯৬০ সালের ২৫মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তৈরী করছিলেন পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রেরিত প্রশ্নে জওয়াব। সেই কাজ সমাপ্ত করার পূর্বেই মৃত্যুর করাঘাত তাঁকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। তাঁর সেই অন্তিম মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন মাওলানা রাগেব আহসান। মওলানার মৃত্যুর পর তাঁর সেই মুহূর্তের বর্ণনাটি মূল উর্দু থেকে অনুবাদ করেন মোঃ আব্দুর রহমান, যা তর্জুমানুল হাদীছের ৯ম বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা ১৯৬০-এ প্রকাশিত হয়। তাওহীদের ডাক পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি পত্রস্থ হল- নির্বাহী সম্পাদক]।

এ বৎসর ৩রা জুন হজ্জে আকবর সুসম্পন্ন করার পর বিশ্ব মুসলিম পরবর্তী দিবস ৪ঠা জুন পবিত্র ধাম মক্কার সন্নিকট মীনাতে যখন ভেড়ী, বকরী এবং উষ্ট্রের কুরবানী দিতে রত ঠিক সেই দিবসেই আল্লাহ্‌র বান্দা মুজাহেদে ইসলাম আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেব ঢাকা নগরীতে মিল্লাতে ইসলামের খেদমতে নিজের জীবনকে কুরবানীর জন্য নিবেদিত করলেন। ১৯৬০ ঈসায়ীর ২৫শে মের রাত্রে যে প্রতিশ্রুতি তিনি প্রদান করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখালেন।

খেলাফত আন্দোলন এবং আযাদী সংগ্রামের মুজাহেদে আ'যম, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি, 'তর্জুমানুল হাদীস' ও 'আরাফাত' সম্পাদক আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী সত্যই আল্লাহ্‌র পথে এক উৎকৃষ্ট প্রাণ মুজাহেদের জীবন অতিবাহিত করে গেলেন এবং খাঁটি শহীদে মিল্লতের শাহাদত বরণ করে ধন্য হলেন। দেশ জাতির সেবায় তাঁর ঈমানী জোশ ও অটল সঙ্কল্প, ত্যাগ ও কুরবানী এবং সত্যের উপর অবিচল নিষ্ঠার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এক সঞ্জীবনী শক্তি ও প্রেরণার চির অম্লান উৎসরূপে বিরাজমান থাকবে।

১৯৬০ সালের ২৪শে মে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেবের দুজন প্রতিনিধি (বংশালের রঈস হাজী মোহাম্মাদ আকীল এবং অধুনালুপ্ত দৈনিক নাজাতের প্রাক্তন সম্পাদক কাজী আবদুশ শহীদ) বক্ষমাণ প্রবন্ধের লেখকের ঢাকাস্থ গৃহে (২৫ নং মিঞা সাহেবের ময়দান) তশরিফ আনয়ন করেন। আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেবের সালাম এবং সংবাদ পৌঁছিয়ে তাঁরা বলেন, 'তিনি পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে পরামর্শের উদ্দেশ্যে আপনার সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। কিন্তু পিত্তশূলের বেদনা এবং রোগের তীব্রতার কারণে তাঁর পক্ষে এ পর্যন্ত আসা সম্ভব হয়ে উঠেনি'। আমি বললাম, 'মওলানা সাহেবের অপারেশন এবং প্রতিকূল স্বাস্থ্যের সংবাদ আমি অবগত আছি। তার কষ্ট স্বীকার অনুচিত। ইনশাআল্লাহ আমিই আগামীকাল্য তাঁর খেদমতে হাযির হ'ব।'

প্রতিশ্রুতিমত পর দিবস ২৫শে মে বান্দা 'আরাফাত' দফতরে গিয়ে হাজির হ'ল। গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি শক্তিহীন এবং অত্যন্ত দুর্বল। তিনি বললেন, 'অপারেশন বিফল হয়েছে, পিত্তকোষে কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বেদনা আগের চাইতেও বর্ধিত হয়েছে, দুর্বলতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা আমাকে পানি থেকে তীরে নিক্ষিপ্ত অসহায় মৎসের ন্যায় বিচলিত করে তুলেছে। পাকিস্তানকে একটি সেক্যুলার স্টেটে পরিণত করার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে, সে দৃশ্য অবলোকন করে আমি কিছুতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পাচ্ছিনা। এখন শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া একান্ত আবশ্যক, এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ এবং সাহায্য একান্তভাবে কামনা করি।'

আমি বললাম, বান্দা যেকোন খেদমতের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দেশের বিশিষ্ট আলেম এবং চিন্তাশীল সুধীবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, বিশেষ করে যারা ১৯৫১ ও ৫৩ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেব বললেন, এ ধরণের বৈঠকে দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ঢাকা শহরে অবস্থানরত চিন্তাবিদ ও আলেমগণের তরফ থেকে যদি প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া যায় তা হলেই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। আমি পুনরায় আমার অভিমত পেশ করলে তিনি বললেন, আসল কথা আমি এবার ঈদে কুরবান আমার পিতৃভূমি দিনাজপুর জিলার নুরুল হুদায় উদযাপন করার ইচ্ছা পোষণ করছি। তাই অনুরোধ, মেহেরবানী করে একাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করুন।

আমি এর উত্তরে নিবেদন করলাম, হযরত, এটা মিল্লাতের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নাযুক কাজ। এজন্য আপনাকে তো ঈদে-কুরবানকে বলিদান করতে হবে।

কথায় কথায় অতর্কিত মুখ থেকে বড় কথাই বের হয়ে গেল, কিন্তু মনে বড়ই বেদনা বোধ করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল একটা অসাধারণ কথা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের অদৃশ্য কোঠা থেকে অতর্কিত মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমি তখন পশ্চিম দিকে মুখ করে এক চেয়ারে উপবিষ্ট, আমার ডাইনে হাজী

মোহাম্মদ আকীল সাহেব এবং বামে কাজী আব্দুশ শহীদ সাহেব-দুজন দুই চেয়ারে বসে। মওলানা মুস্তাছের আহমাদ রহমানী ফরশের উপর আর হযরত আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সামনের রোগ শয্যায় উপবিষ্ট।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং হযরত আল্লামা। ঈমানের জোশ ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় অন্তরস্ফূর্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে উত্তর করলেন :

ইনশাআল্লাহ কুরবানীর জন্য আমি প্রস্তুত। এই মহান কাজের জন্য ঈদের কুরবানকেও বলিদান করতে আমি কুণ্ঠিত হব না। এখন যেভাবেই হোক আপনি একাজের ব্যবস্থা করুন।

পূর্ব দিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঢাকার কতিপয় চিন্তাবিদ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৬শে মে মওলানা সাহেবের রোগ প্রকোষ্ঠে একত্রিত হলেন। রাত্র ১১ ঘটিকা পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর দীর্ঘ আলোচনা চলল। মওলানা সাহেব অভিযোগ করলেন, এই ব্যাপারে কতিপয় স্থানে যাতায়াতের দৌড়ধাপে তিনি পুনরায় বেদনার ভাব অনুভব করছেন, জ্বরও এসে গিয়েছে, তবিয়ত তখন অনুকূল নয়- তাই তাঁর প্রস্তাব এবং সকলের সম্মতিক্রমে স্থির হ'ল মওলানা রাগেব আহসান সাহেব কমিশনের প্রশ্নাবলীর বিস্তৃত জওয়াব সহ একটি খসড়া প্রস্তুত করবেন। পরবর্তী ৩রা জুন ওলামা এবং সুধিবৃন্দের একটি বৈঠকের অধিবেশন হবে। মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেব এই বৈঠকের দাওয়াত নামা প্রেরণ করবেন এবং আরাফাত অফিসেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আমি সেই মজলিসে আমর মুসাবিদা পেশ করব। মওলানা সাহেব আমাকে বারবার এইকথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র, দেশ ও মিল্লত এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রামাণিক ও যুক্তিসিদ্ধ জওয়াব লিখতে হবে। আমি এ দায়িত্ব স্বীকার করে নিলাম। রাত্র সাড়ে এগারটায় অন্য সকলে বিদায় নেওয়ার পর মওলানা সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে স্বীয় কামরার দরওয়াজা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। বিদায় মুসাফাহা কালে আমি মওলানা সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনিও যেন তাঁর লিখনী ধারণ করেন। তিনি তাঁর অসুস্থতার ওযর অবশ্য পেশ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হলেন।

২৮শে মে মওলানা সাহেব বললেন, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মওলানা আকরম খানের সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি তাঁর নিকট এবং আরও কয়েক জায়গায় ঘুরাফেরা করেছিলেন। ফলে তিনি জ্বরে আক্রান্ত এবং তাঁর পিত্তপ্রদাহ ও পিত্তশূল বর্ধিত হয়েছে। চিকিৎসকগণের নিষেধ অগ্রহ্য করেই তিনি একাজ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম আর পাকিস্তানের কোন সমস্যা যখন গুরুতর আকারে দেখা দেয় তখন নিজের স্বাস্থ্য আর জানের সম্বন্ধে একদম বেপরওয়া হয়েই তিনি কাজে নেমে পড়েন। কারণ সবকিছুর উর্ধ্বে মিল্লতের স্থান। প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ের এই অনুভূতির দ্বারাই তিনি পরিচালিত।

বেদনার প্রতিযোগিতা : পিত্তশূল বনাম কওমী দরদ

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী বছরের পর বছর পিত্তশূলের আক্রমণে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করে আসছিলেন। পশ্চিম বাঙ্গলার বর্তমান মুখমন্ত্রী ডাক্তার বি.পি. রায়ের তত্ত্বধানে একবার কোলকাতায় তাঁর পেটে অপারেশন করা হয়। কিন্তু পূর্ণ নিরাময় লাভ ঘটে উঠে নাই। এদিকে জীবনের সায়াহ্নে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, রক্তের চাপ, বহুমূত্র, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু এই সব জটিল রোগের পৌনপুনিক আক্রমণ তাঁর মানসিক শক্তিকে বিন্দুমাত্রও দুর্বল করে তুলতে পারেনি। ইতিহাস, ইসলাম এবং জ্ঞানগর্ভ যেকোন বিষয়ের আলোচনায় তাঁর মস্তিষ্ক পুরাপুরি সতেজ ও সক্রিয় হয়ে উঠত। এভাবেই এলমী খেদমতের কাজ দস্তুরমত তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার শামসুদ্দীন এবং ডাক্তার আসিরুদ্দীন সাহেবান কয়েকবার এক্সরে এবং বিভিন্নরূপী পরীক্ষার পর এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মওলানা সাহেবের পিত্তকোষে পাথর হয়েছে এবং অপারেশন ছাড়া এর চিকিৎসার অন্য কোন উপায় নেই। মওলানা সাহেব অস্ত্রোপাচারে রাজি হলেন এবং ডাক্তার আসিরুদ্দীন অপারেশন করলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় অপারেশন করেও কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া গেলনা। মওলানা সাহেব মেডিক্যাল কলেজের বিশেষ ক্যাবিনে কয়েক মাস পর্যন্ত জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান হয়ে রইলেন। প্রতিদিন প্রায় ৫০ টাকা করে খরচ হতে লাগল। কয়েক মাস পর অস্ত্রোপাচারের জখম কিছুটা শুকানোর পর বাসায় (আরাফাত অফিসে) প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এখানে আসার পর বেদনার শুধু পুনরাক্রমণই ঘটলনা বরং পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর আক্রমণ ঘন ঘন হতে লাগল। আর কষ্টও এত অসহনীয়ভাবে বর্ধিত হত যে, অনেক সময় বেহুশীর ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিত। কিন্তু ধন্য তাঁর এবং সামাজিক কর্মতৎপরতার এতটুকুও ভাটা পড়লনা। সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের সম্পাদনা, প্রবন্ধাদির রচনা, ইসলামী গ্রন্থরাজির প্রণয়ন, ঢাকাস্থ মাদ্রাসাতুল হাদীসের তত্ত্বাবধান এবং সর্বোপরি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতিত্বের ন্যস্ত দায়িত্ব শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে গেলেন।

এত সব কাজের উপর পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের সম্মুখে পূর্ব পাকিস্তানের আলেম, ফাযেল একং ইসলামপন্থীগনের একটি শাসনতান্ত্রিক সুফারিশ প্রস্তুত এবং পেশ করার কাজ একান্ত জরুরী হয়ে দেখা দিল। আর শেষ এই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর জীবনবিনাস ঘটিয়ে দিল। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলেম, ফাযেল এবং চিন্তাবিদের একত্রিত করা এবং আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের বিশ্বাস ও অভিমতসমূহের মধ্যে সমন্বয় বিধান কত্ত বড় কঠিন এবং সমস্যাঙ্কুল কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এর

জন্য যে অপরিমেয় ধৈর্য এবং সাধনার অনুশীলন প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। প্রকাশ্যতঃ আর কেউ যখন এগিয়ে এলেন না, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী তখন কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না, নিজের স্বাস্থ্য এবং জীবন পণ রেখে এই কঠিন কাজের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিলেন। বেহুশ হয়ে পড়ার মাত্র দুদিন পূর্বে মওলানা সাহেব আমার নিকট থেকে এক পত্র বাহকের মারফত শর্ষিনার পীর মওলানা আবুজাফর সালেহ এবং মাদ্রাসা আলীয়া দারুস সুন্নতের সেক্রেটারীর টেলিগ্রাম ঠিকানা সংগ্রহ করে নিলেন। তাঁদের নিকট টেলিগ্রামে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দিলে তিনি তাঁর স্বাস্থের সঙ্কটজনক অবস্থার ভিতরেই মজলিসে শূরার সমুদয় বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

অতঃপর আমার নিবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি নিজেও প্রশ্নমালার উত্তর লিখতে বসে গেলেন, যদিও তাঁর পিত্তশূল ক্রমে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু দেখা গেল মওলানা সাহেব তাঁর শয্যার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র টেবিলে কেতাবপত্র সংস্থাপন করে লিখে চলেছেন ডাইন হাতে অবিরাম গতিতে কলম চলছে, বাম হাতে বক্ষদেশে বেদনাস্থল চেপে রেখেছেন, মাঝে মাঝে বেদনার অনুভূতি যখন সহ্য সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন হাত দিয়ে ডলা শুরু করছেন। এইভাবে দুই বেদনার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল **একদিকে শরীর অভ্যন্তরে পিত্ত বেদনা অন্যদিকে মিল্লতের জন্য তাঁর অন্তর বেদনা**। দুই বেদনার তুমুল সংগ্রাম। আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা আবদুল্লাহেল কাফীর অটল সংকল্প : তিনি তাঁর আরম্ভ কাজ সমাপ্ত করবেন, তবে উঠবেন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।।

পয়লা জুন, ১৯৬০। জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারী মৌলবী মীযানুর রহমান বি.এ বি টি সাহেব উপরে এলে মওলানা সাহেবকে উপরোক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আরয করলেন, হযরত নিজের শরীরের উপর রহম করুন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল করুন, ডাক্তারের কড়া নির্দেশ; শরীরকে আরাম দিতে হবে।

মওলানা সাহেব উত্তর করলেন, আপনাদের মুখে ঐ এক কথা : স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য। কিন্তু আমি স্বাস্থ্যের দিকে কি নযর দিব- এখন আমার জানেরও কোন পরওয়া নেই, সমস্তই পাকিস্তান ও ইসলামের জন্য উৎসৃষ্ট। এখন আপনি যান, নিচে গিয়ে দফতরের কাজ দেখুন, আমাকে আমার কাজ শেষ করতে দিন। এই বলে পূর্ববৎ বাম হস্তে বক্ষস্থলে জোরে চেপে ধরে অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় কাজ করে চললেন। কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের ৩৮টি জওয়াব পর একদম অবশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন। বেদনার তীব্রতার অনুভূতিহীন ও শক্তিহারা অবস্থায় মেঝের উপর স্থাপিত পালঙে নিপতিত হলেন আর এই পড়াই তাঁর শেষ পড়া আর উঠতে সক্ষম হননি। ব্যাস! এই ছিল দুনিয়ায় তাঁর শেষ কাজ-অন্তিম কর্তব্য। ২রা জুন বেদনা তীব্রতর আকারে দেখা দিল, একেবারে বরদাশত সীমার বাইরে চলে গেল, দুর্বলতাও ক্রমে বর্ধিত হয়ে চলল। ডাক্তারগণ হৃৎপিণ্ডকে অবসাদমুক্ত ও সবল রাখার জন্য শরীরে রক্ত দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ফল কিছুই হলনা। সংজ্ঞাহীনতা গভীরতার দিকেই এগিয়ে চলল।

৩রা জুন, শুক্রবার। আজ হজ্বে আকবর! আরাফাতের ময়দানে বিশ্ব মুসলিমের সম্মেলন দিবস! ঠিক এই দিবসেই মওলানা সাহেব কর্তৃক পরামর্শ সভার বৈঠকে আহুত। মওলানা সাহেবের মুদ্রিত দাওয়াতনামা পেয়ে বাঙ্গলার বিশিষ্ট আলেম, ফাযেল এবং চিন্তাবিদগণ রোগ প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন নব সংস্কৃতি বৃহত্তর প্রকোষ্ঠে সমবেত। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই মওলানার পার্শ্বদেশে সমবেত। কিন্তু হায়! আমন্ত্রণকারী এবং মজলিসের প্রাণ স্বয়ং মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যায় শায়িত-জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস তিনি টেনে চলেছেন। ডাক্তারগণ, উলামা, ফুযালা, বন্ধুবর্গ, ছাত্রবৃন্দ সকলেই তাঁকে ঘিরে আছেন। ডাক্তাররা জওয়াব দিয়ে বলে দিলেন, ব্যাস, মাত্র দু এক ঘন্টার মেহমান তিনি। সকলে সমস্বরে জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন মর্মবিদারক করুণ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি।

কিন্তু তবু সেই মহান কাজ সমাধা করতে হবে, যে কাজের দায়িত্ব মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী নিজ ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। আমার প্রস্তাবক্রমে মওলানা আকরম খান পরামর্শ সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আমি মওলানা সাহেবের আহ্বান, মজলিসে শূরার সূচনা আর আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করলাম। আর সর্বশেষ একটি সাব কমিটি গঠন করে তার উপর আনুষ্ঠানিক কাজের দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব উত্থাপন করলাম এবং সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর হ'ল। হাজী মোহাম্মাদ আকীল সাহেব মওলানা সাহেবের হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে লিখিত কমিশনের প্রশ্নাবলীর জওয়াবের মুসাবিদা পেশ করলেন। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব মন্তব্য করলেন, এই মহান স্মৃতি বিজড়িত এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বে মহীয়ান মুসাবিদা সযত্নে সুরক্ষিত রাখার যোগ্য। আমি তখন বললাম, এই খসড়া রায়ীসুল আহরার মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের সেই ঐতিহাসিক সুদীর্ঘ চরমপত্রের সঙ্গে তুলনীয়, যা তিনি তাঁর রোগশয্যায় বসে ভয়ঙ্কর ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় ডাক্তারগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী লণ্ডনের হাইড পার্ক হোটেল থেকে হিন্দুস্তান এবং মিল্লতে ইসলামিয়ার আযাদীর উদ্দেশ্যে বৃটেনের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নাম লিখেছিলেন। সেই মেহনতের প্রতিক্রিয়ায় তিনি ৩রা জানুয়ারী মূচ্ছিত হয়ে পড়েন। ৪ঠা জানুয়ারী ছুবহে সাদেকের সময় শাহাদৎ বরণ করেন। আজ এই সময় আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফীর বেলাতেও ঠিক সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মওলানা আকরম খান এবং অন্যান্য সকলেই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হলেন।

এই প্রবন্ধ লেখকের প্রস্তাব ক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল যে পরামর্শ সভার পরবর্তী বৈঠক ঈদে কুরবানের পর ১০ই জুন

আহ্বান করা হোক এবং সেই মজলিসের সম্মুখে লেখকের বিস্তৃত শাসনতান্ত্রিক চিত্র এবং মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের তত্ত্বমূলক প্রস্তাবনা উভয়ই পেশ করা হোক।

অতঃপর সকলেই বেদনা বিধুর অন্তরে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের জন্য মোনাজাত করলেন। বৈঠকের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ সাহেব আবেগ বিহ্বল অন্তরে মন্তব্য করলেন 'এ এক পরম বাঞ্ছিত মৃত্যু! ইসলামের এবম্বিধ আযিমুশশান খেদমতে স্বীয় শক্তি এবং দেহের শেষ রক্ত বিন্দু ব্যয় করতে করতে নিজের আহূত সভার সম্মুখে জীবন দানের এমন অনুপম তওফীক অর্জন ক'জনের ভাগ্যে জুটে! দেখুন, ওর রক্তের সর্বশেষ কাতরাটিও ইসলামের খেদমতে নিবেদিত হচ্ছে।

আমরা এ ধরণের আলোচনায় রত এমনি সময় মওলানা সাহেবের শয়ন কক্ষে হঠাৎ জোর ক্রন্দনরোল উত্থিত হ'ল। সকলেই বৈঠক ছেড়ে মওলানা সাহেবের কামরার দিকে ধাবিত হলেন, গিয়ে দেখলেন তাঁর চক্ষুদ্বয় বিস্ফোরিত, কণ্ঠ নালিতে গোঁ গোঁ শব্দের কাতরানি এবং তিনি সম্পূর্ণ মুচ্ছিত! একবার মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত নিঃসৃত হয়েছে। এর আগে আর কোন সময় রক্ত নির্গত হয়নি। ডাক্তার বলেছিলেন এ আর কিছু নয়, অভ্যান্তরীন রক্ত প্রবাহ। অন্যদের ধারণা অপারেশনের স্থানে সেলাই ছিড়ে গিয়েছে এবং সম্ভবতঃ সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে সকলেই নিরাশ হয়ে গেল। মজলিস তখন তখনই ভেঙ্গে গেল। সেদিন ছিল জুমার দিবস। আসরের ওয়াক্ত। শুক্রবার এভাবেই অতিক্রান্ত হ'ল। শনিবারের রাতও প্রায় শেষ হ'ল ইয়াওমুননাহার (কুরবানীর দিবস) শনিবার ৪ঠা জুন, ১৯৬০ খৃ: ভোর ৪টা ২৫মিনিটে যখন মসজিদে মসজিদে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে গেছে, জামাত খাড়া হবে, এমন শুভ মুহূর্তে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল্লাহ্র আহ্বানে সাড়া দিলেন। তাঁর দাওয়াতে কবুল করে লাব্বায়েক বললেন। বাঙ্গালা তার প্রদীপ হারাল, পাকিস্তান আলোকশূন্য হ'ল। এলম ও দীনের মজলিস ভেঙ্গে গেল। ইসলাম জগত আজ এমন এক আলেম বাআমল, সত্য ও স্বাধীনতার জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ মুজাহেদ, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, প্রথিতযশা মুহাদ্দেস, মহামান্য মুফাসসের, অতুলনীয় তত্ত্ববিধ, ইসলামী শাসনতন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ, ঐন্দ্রজালিক বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, আপদমস্তক দরদে ভরপুর দেশপ্রেমিক, মিল্লতের বেলালী রূহ ও বজ্রগম্ভীর ব্যক্তিত্ব হতে চিরতরে বঞ্চিত হল। যিনি সারা জীবন লক্ষ লক্ষ অসাড় দেহে জীবনবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, সহস্র সহস্র আড়ষ্ট মস্তিস্ককে রওশনদীপ্ত ও বুদ্ধি সচেতন করে তুলেছেন এবং সংখ্যাতীত নওজোয়ানকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। *(ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেঊন)*।

ঢাকাস্থ বংশাল জামে মসজিদে মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী সাহেব জানাযায় ইমামতি করলেন। জানাযায় বহু ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন। যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন গবর্ণর জেনারেল খাওয়াজা নাজিমুদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উযিরে আলা মি: নূরুল আমীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মওলানা মরহুমের অছিয়ত মুতাবেক শবদেহ বৈকালিক ট্রেনে দিনাজপুর জিলাস্থ নূরুল হুদা গ্রামে প্রেরিত হ'ল। ময়মনসিংহ, জামালপুর, বাহাদুরপুর, বোনারপাড়া গাইবান্ধা, রংপুর প্রভৃতি স্টেশন হতে শত শত লোক জানাযার সঙ্গে সঙ্গে নূরুলহুদা অভিমুখে রওয়ানা হল। ৫ই জুন, ১৯৬০ খৃ: রবিবার অপরাহ্নে শবদেহ নূরুল হুদা পৌছল। সহস্র সহস্র লোক পুনঃ জানাযায় অংশগ্রহণ করল। লোকাধিক্য ও ভীড়ের দরুণ নূরুলহুদায় দু' দুবার জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করতে হ'ল। সূর্য পশ্চিম দিক চক্রবালে ঢলে পড়ার প্রাকমুহূর্তে ইলম ও জিহাদের এই আলোক-উজ্জ্বল সূর্যকে তাঁহার মহামান্য পিতা ও মাতার পাদদেশে সমাধিস্থ করা হ'ল। ইছলামী শাসনতন্ত্রের জন্য এবার ঈদে কুরবানের আনন্দকে বিসর্জন দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং ঈদের কুরবানের পূর্বেই নূরুল হুদায় পৌঁছার প্রবল আকাঙ্খা দুই-ই এরূপ আশ্চর্যজনক ভাবে পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হ'ল।

নিজেকে জানুন!

- ❖ **১ বছরের মূল্য বুঝতে চান?**
  যে পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, তাকে জিজ্ঞেস করুন!
- ❖ **১ মাসের মূল্য বুঝতে চান?**
  যে তার বেতন পায়নি, তাকে জিজ্ঞেস করুন!!
- ❖ **১ সপ্তাহের মূল্য বুঝতে চান?**
  যে হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করুন!
- ❖ **১ দিনের মূল্য বুঝতে চান?**
  যে ছিয়াম (রোযা) রেখেছিল, তাকে জিজ্ঞেস করুন!
- ❖ **১ ঘন্টার মূল্য বুঝতে চান?**
  যে প্রিয়জনের অপেক্ষায় ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করুন!
- ❖ **১ মিনিটের মূল্য বুঝতে চান?**
  যে ট্রেন মিস করেছিল, তাকে জিজ্ঞেস করুন!
- ❖ **১ সেকেন্ডের মূল্য বুঝতে চান?**
  যে এক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তাকে জিজ্ঞেস করুন!

জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের জন্য খুব মুল্যবান! গতকালটা আমাদের জন্য ইতিহাস, আগামীকাল অজানা। আর আজকের দিনটা আমাদের জন্য উপহার। যাকেই বলে বর্তমান, এই বর্তমানকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন, আল্লাহকে ভয় করুন।

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (রহ.)-এর কুরআনী খেদমত

- ড. মুখতারুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাফসীর নিয়ে কিছু কথা :

পবিত্র কুরআনের তাফসীর আক্বীদা, তাওহীদ এবং রিসালাতের উপর ভিত্তি করে রচিত হতে হবে। কিন্তু বর্তমান তাফসীরের বর্ণনাগুলি অনুমান নির্ভর এবং ইখতিলাফে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত বিগত যুগের জাতি ও গোষ্ঠীর কাহিনীগুলিতে যে ধরণের বাড়াবাড়ি এবং খেয়ানত করা হয়েছে, তা সত্যিই দুঃখজনক!

পাক-ভারত উপমহাদেশে রচিত তাফসীরগুলিতে উপমহাদেশের মানুষের রুচিবোধ এবং ধর্মীয় পরিবেশ পরিস্থিতির অনেক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। মুফাসসিরগণের ধর্মীয় পরিবেশ পরিস্থিতি উপলব্ধিতে থাকা সত্ত্বেও তারা পবিত্র কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ ও তাওহীদ ভিত্তিক মতবাদের ঘোর সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। এর বিপরীতে হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ পবিত্র কুরআন ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক তাফসীর রচনায় এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তিনি বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের নবী তাদের বললেন, তার শাসক হবার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূণ পরিবারের পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ। ফেরেশতাগণ ওটি বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(বাক্বারাহ ২/২৪৮)*।

আয়াতে বর্ণিত সিন্দুকটি ছিল ইহূদীদের নিকট বরকতের প্রতীক। ইবনু আব্বাস, রবী বিন আনাস প্রমুখ বলেন, এর মধ্যে হারূণ ও মূসার লাঠি, তাদের কাপড়-চোপড়, তওরাতের ফলক সমূহ ইত্যাদি সংরক্ষিত ছিল। আমালেক্বারা যখন ইহূদীদের তাড়িয়ে দিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল করে, তখন সিন্দুকটি তারা রেখে দেয়। অতঃপর তালূতের শাসক নিযুক্তির নিদর্শন হিসাবে ফেরেশতারা আল্লাহ্র হুকুমে উক্ত সিন্দুক উঠিয়ে নিয়ে চলে আসে এবং তালূতের সামনে এনে রেখে দেয়। যা সকলে প্রত্যক্ষ করে। তখন সবাই তাকে শাসক হিসাবে মেনে নেয় *(ইবনু কাছীর)*।

কিন্তু পরবর্তীতে সিন্দুকটিতে বরকতের নামে কত যে কপোলকল্পিত কাহিনী রচিত হয়েছে, তার হিসাব কে রাখে। বনী ইস্রাইল যুগের সিন্দুকটি নিয়ে অনেক তাফসীরকারক নবী করীম (ছাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মাদীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ব্যাখ্যা করে থাকেন। শুধু তাই নয় বুযুর্গ ও ছালেহীন খ্যাত ভণ্ড পীরেরা পীর-মুরীদী খেলায় মেতে উঠে এবং তারা বিপদে পতিত ও কষ্টক্লিষ্ট মানুষদেরকে বরকত দেওয়ার নাম করে অনেক গল্প-কাহিনী বর্ণনা করেন। আর মানুষরা তার ফায়েয হাসিল করার জন্য পাগলপারা হয়ে অনেক দূর থেকে এসে তাদের পায়ের তলায় সিজদায় পড়ে যায়। অথচ এসব কাহিনীর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই।

নবী পাগল কোন কোন মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর জুতা মুবারককে বরকতের হাসিলের উপলক্ষ মনে করে, প্রতীকী জুতা বানিয়ে বরকত হাসিলের হাস্যকর খেলায় মেতে উঠে। তারা প্রতীকী জুতাকে নানা ধরণের নতুন নতুন মিথ্যা কাহিনীর আবরণে ঢেকে রাসূলী জুতার আবেগী আবহ সৃষ্টি করে। জুতা বাড়ির এক কোণে লটকিয়ে রেখে বৈষয়িক যাবতীয় চাওয়া পাওয়া ও মুশকিলে আসান বা সকল সমস্যার সমাধাকারী অসীলা হিসাবে গণ্য করে। আর তা ব্যবহারের বিভিন্ন তরীকা ও মতলববাজী তো রয়েছেই। পাশাপাশি তারা পীর-বুযুর্গদের কবরে নযর-নেওয়ায দেওয়ার মাধ্যমে বরকত হাসিলের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে থাকে। পীরের কবর ধুয়েমুছে ছাফ করা, কবর ধোয়ার পানিকে বরকতের পানি মনে করা, পীর সাহেবের কবর ধোয়াকে বায়তুল্লাহ কা'বাকে ধৌত করার সমান গণ্য করা ইত্যাদি। তারা কিভাবে এ ধরণের দুর্গন্ধময় নর্দমার পানিকে বরকতী পানি মনে করতে পারে? তারা বেমালূম ভুলে যান যে, গায়রুল্লাহ নামে এসমস্ত গর্হিত কর্মকাণ্ড স্পষ্ট শিরক এবং ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী।

কুরআনে নাসেখ এবং মানসূখের আলোচনা :

কুরআনের তাফসীরে বড় একটা জায়গাজুড়ে নাসেখ এবং মানসূখের আলোচনা বিধৃত হয়েছে। আর আলোচনাটিও কুরআনে বৈচিত্র্যময় আলোচনার একটি। এ বিষয়ে ইসলামী পণ্ডিতগণ পৃথক বড় বড় বই লিখেছেন। অনেক মুফাসসির এ বিষয়ে পদস্খলিত হয়েছেন। কেউ কেউ দয়া ও পারস্পরিক সহানুভূতির আয়াতগুলো দিয়ে পবিত্র জিহাদের আয়াতসমূহকে মানসূখ প্রমাণ করেছেন। আবার কেউ কেউ কুরআনে বর্ণিত আয়াত নাসেখ এবং মানসূখের আলোচনাই প্রবেশই করেননি।

কিন্তু ছালাহুদ্দীন ইউসুফ নাসেখ মানসূখ বিদ্যাকে কুরআনের অমূল্য রত্ন জ্ঞানভান্ডার মনে করেন। তিনি নাসেখ মানসূখ মাসআলাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি আলোচনা শুরু করেছেন সূরা বাক্বারাহ কয়েকটি আয়াত দিয়ে। মহান আল্লাহ বলেন, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ 'আমরা কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা তা ভুলিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি।

তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী? তুমি কি জানো না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব কেবল আল্লাহ্র জন্যই? আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১০৬-১০৭)*।

তিনি উক্ত আয়াতের আলোকে শারঈ দৃষ্টিকোণ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এ বিষয়ে জাতির সামনে বহুবিধ শিক্ষাগুলো উপস্থাপন করেছেন।

نسخ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো মানসূখ বা রহিত করা। কিন্তু শারঈ ব্যাখ্যাগত দিক দিয়ে এটি এমন একটি বিষয় যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শারঈ একটি হুকুম পরিবর্তন করে নতুন আরো সুন্দর বিধান চালু করেন। কুরআন থেকে কোন আয়াত গায়েব করার বিষয় এটি নয়। আর নাসেখ মানসূখ বিষয়টি একান্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়। অন্য কারো তরফ থেকে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের বিষয় এটি নয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হযরত আদম (আঃ)-এর যুগে আপন ভাই বোনের সাথে বিবাহ জায়েয ছিল। পরবর্তীতে সেটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হারাম ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিভিন্ন আয়াত ও আহকামকে মানসূখ করেছেন এবং তদস্থলে নতুন বিধানাবলীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। এটি তাঁরই শান।

তবে নাসেখ মানসূখ আয়াত সংখ্যা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর লিখিত গ্রন্থ الفوز الكبير-এ শুধুমাত্র পাঁচটি বলেছেন। উক্ত নাসেখ আয়াতসমূহ আবার তিনভাগে বিভক্ত।

১. সাধারণ নাসেখ মানসূখ আয়াত : একটি আহকাম পরিবর্তন করে, অন্যটি একটি আহকাম চালু করা।

২. তিলাওয়াতে নাসেখ মানসূখ : প্রথম বিধানের শব্দগুলো কুরআন মাজীদে থেকে গেছে এবং পরবর্তীতে বিধানটিও কুরআন মাজীদে থেকে গেছে। মূলত নাসেখ এবং মানসূখ উভয় বিধানটিই কুরআন মাজীদে মওজূদ রয়ে গেছে।

৩. মানসূখকৃত আয়াত : পবিত্র কুরআনে আয়াতটি মওজূদ নাই। কিন্তু বিধানকে রাসূল (ছাঃ) রেখে দিয়েছেন। যেমন : সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমর (রাঃ) যখন মিনা হতে প্রত্যাবর্তন (২৩ হিজরী) করলেন তখন তিনি (মক্কার অনতিদূরে) 'আবতাহ' নাম স্থানে তাঁর উট বসালেন। আর এদিকে কতকগুলি পাথর একত্র করলেন। তার উপর একখানা চাদর রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর আকাশের দিকে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার অনেক বয়স হয়েছে। শক্তি রহিত হয়ে গেছে। প্রজাবৃন্দ অনেক। এ সময় আপনি আমাকে আপনার নিকট ডেকে নিন, যাতে আমার দ্বারা আপনার কোন আদেশ অমান্য না হয়ে যায় এবং আপনার ইবাদতে অনিচ্ছা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি মদীনা চলে গেলেন, মদীনার লোকদের সম্মুখে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, হে উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের সম্মুখে সমস্ত পথই প্রকাশ হয়ে পড়েছে; যত রকম ফরয কাজ ছিল সমস্তই নির্ধারিত হয়ে গেছে। তোমরা পরিষ্কার সোজা পথে চালিত হয়েছ। এখন তোমরা পথ ভুলিয়া যেন এদিক-ওদিক বিপথগামী না হয়ে যাও। তিনি তার এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে বললেন, দেখ, তোমরা প্রস্তরাঘাতের আয়াতটি ভুলে যেও না। কেউ যেন না বলে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে প্রস্তরাঘাতের আয়াত দেখছি না। দেখ, আল্লাহ্র রাসূল প্রস্তরাঘাত করেছেন। ঐ আল্লাহ্র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মানুষ এ কথা না বলত যে, উমর আল্লাহ্র কিতাবে অতিরিক্ত করেছেন তা হল আমি (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ) (অর্থাৎ যখন বিবাহিত পুরুষ অথবা নারী ব্যভিচার করে তবে তাদেরকে প্রস্তরাঘাত কর) আয়াতটি কুরআনে লিখে দিতাম।

আমরা এই আয়াত পাঠ করেছি। অতঃপর তার তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে (কিন্তু তার হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে)। সাঈদ বলেন, অতঃপর যিলহজ্জ মাস শেষ না হতেই উমর (রাঃ) নিহত হলেন।[১]

উল্লেখিত দলীলে প্রথম দু প্রকারের নাসেখের বর্ণনা রয়েছে। এখানে উদিষ্ট উদ্দেশ্য হলো হুকুম এবং তেলাওয়াত দু'টিই রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং নতুন বিধান চালু করে দিয়েছেন অথবা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তর থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তার স্মৃতি থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছেন। ইহুদীদের তাওরাত থেকে কোন কোন বিধান রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে কিছু বিধানের ক্ষেত্রে মানসূখ অবস্থায় রয়ে গেছে বা তার বিপরীত কিছু বিধান আনায়ন করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত বিধানাবলী রদ করে দিয়েছেন। কেননা যমীন আসমানের বাদশাহী একমাত্র তাঁরই হাতের কব্জায়। তিনি স্থান, কাল, পাত্রভেদে যে কোন বিধান যে কোন সময় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সংশোধনী তাঁরই মানায়। কেননা তিনি সকল যুগের এবং সময়ের খবরদার। তাই যখন যেটা চান, তখন সেটি তিনি করেন। সবকিছু তাঁরই ইচ্ছাধীন। এগুলো সবই তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

আবু মুসলিম আছফাহানী মুতাযেলীর মত কিছু গোমরাহ, নামধারী শিক্ষিত চরমপন্থীরা ইহুদীদের মত কুরআনের নাসেখ মানসূখের মত গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রর্দশন করে।

সালাফে ছালেহীনদের আক্বীদামতে নাসেখ মানসূখ বিধান পবিত্র কুরআনের এক অনন্য বিধান যা আছে এবং থাকবে। এতে কোন প্রকার বাড়াবাড়ির স্থান নেই।

মুহকাম এবং মুতাশাবিহ দ্বন্দ্ব নিরসন :

পবিত্র কুরআনের আয়াত দুই প্রকার ১.মুহকাম ২. মুতাশাবিহ মুহকাম এবং মুতাশাবিহ আয়াতের পার্থক্য কি এবং এর মমার্থই বা কি এবং কুরআনে মুহকাম এবং মুতাশাবিহ স্বরূপ কি- এ বিষয়ে ছালাহুদ্দীন ইউসুফ খোলাখুলি আলোচনা

১. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩০৪৪।*

করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। যার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আর এগুলিই হ'ল কিতাবের মূল অংশ। আর কিছু রয়েছে অস্পষ্ট। অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াত গুলির পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনমত ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অথচ এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর গভীর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে, আমরা এগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সবকিছুই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' *(আলে-ইমরান ৩/৭)*।

ইসলামে বর্ণিত সমস্ত কেচ্ছাকাহিনী, মাসআলা-মাসায়েল, হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ এবং মানবতার সহজ পাঠগুলো মুহকাম আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, যা বুঝতে মানুষকে বেশী একটা বেগ পেতে হয় না।

অপরপক্ষে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব, বিচার ফায়ছালা ও তাক্বদীর সংক্রান্ত মাসলা মাসায়েল, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতাসহ যাবতীয় ইসলামী আক্বীদার জটিল পাঠগুলো সংযোজিত হয়েছে। বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষেই এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে, যা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের হাত ধরে সম্পন্ন হওয়া উচিৎ। কিন্তু যখনই এর ব্যত্যয় ঘটে, তখনই শয়তান সুযোগ বুঝে তার চেলাচামুন্ডাদের আম জনসাধারনের মাঝে ছড়িয়ে দেয় এবং বিভ্রান্ত করে, যেমনভাবে আদি পিতা আদম (আঃ)-কে বিভ্রান্ত করে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল।

শয়তান অজ্ঞদেরকে ভাল করে কুরআন বুঝার নামে ভুলভাল বুঝিয়ে মুতাশাবিহ আয়াতের অতি গবেষণায় লিপ্ত করে এবং ভয়ানক ফেৎনায় ফেলে দেয়। ফলে ব্যক্তিটি ফেৎনার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে কান্ডজ্ঞানহীন কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং ইসলামের বিভিন্ন বুনিয়াদী বিষয়ে নতুন বির্তকের জন্ম দেয়। ফলে সে নিজে বিভ্রান্ত হয় এবং অপরকে বিভ্রান্ত করে।

যেমন ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে আব্দুল্লাহ বা আল্লাহ্র বান্দা এবং নবী হিসাবে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু মুতাশাবিহপন্থীগণ এটা নিয়ে এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে, তারা খিস্টানদের মত ঈসা (আঃ)-কে রুহুলুল্লাহ এবং কালিমাতুল্লাহ বলে আল্লাহ্র বেটা বানানোর প্রান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত হয় যা স্পষ্টই গোমরাহী।

মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতগুলি নিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা খোলাখুলিভাবে বিবৃত করেছেন যা কোন বিবেকবান মানুষের সন্দেহ পতিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

কিন্তু মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান মুহকাম ও মুতাশাবিহ বির্তক পুঁজি করে বনু আদমকে বিভ্রান্ত করতে মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং সর্বত্র সন্দেহের জাল বিছিয়ে মানুষদেরকে চরমভাবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।

ফলে যুগে যুগে বিভিন্ন বাতিল ফিরকাগুলি মুতাশাবিহ আয়াতের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়ে নিজেদের পালে হাওয়া দিতে গিয়ে কালজয়ী ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

অতএব হক্ব পিয়াসী মুমিনের কর্তব্য হবে, ছহীহ আক্বীদা ও আমল পরিচালিত হবে মুহাকাম আয়াত সমূহের উপর ভিত্তি করে এবং সাথে সাথে ইসলামী শারঈ মুহাকাম বিধানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে কুরআনী মুতাশাবিহ আয়াত সমূহ।

চার রাকাআত ছালাতে দুই বৈঠকেই দরুদ শরীফ পড়া :

সাধারণত ছালাতের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে দরূদ শরীফসহ অন্যান্য দোআ-এ মাছূরাহ পড়তে হয়। চার রাকা'আত ছালাতের প্রথম বৈঠকেই আত্তাহিয়্যাতুর সাথে দরূদ শরীফও পড়া যেতে পারে যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু এ বিষয়ে অনেক ফক্বীহ বিদ্বানের বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। তারা বলতে চায় যে, চার রাকা'আত ছালাতের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়াতু ব্যতীত অন্য কিছু পড়ার কোন বিধান ইসলাম সমর্থন করে না। এতদ্ব্যতীত তারা আরো বলে যে, চার রাকা'আত বিশিষ্ট ছালাতে যদি কেউ প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে দরূদ পড়ে, তাহলে তাকে সহু সিজদা দেওয়া ওয়াজিব। নইলে তার ছালাতই হবে না।

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ তাদের অসার মন্তব্যের দলীল ভিত্তিক যথাযথ জবাব দিয়েছেন। তিনি আলোচনার শুরুতেই কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে এসেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*।

তিনি বলেন, অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চাঙ্গের শানমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরেশতাদের মাঝে মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নবীর প্রশংসা ও তারীফ করে থাকেন এবং তার উপর রহমান বর্ষণ করেন। সর্বশেষ তাকে মাকামে মাহমূদাহ বা উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন। ফেরেশতারাও রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদায় প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ দো'আ করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মহান আল্লাহ যমীনবাসীর জন্যও তার উপর দরূদ ও শান্তি বর্ষণের তাকীদ আরোপ করেছেন। যাতে করে আকাশে ও যমীনে সর্বত্র তার প্রশংসার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে।

হাদীছে এসেছে, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضى الله عنه قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. কাব ইবনে উজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপর সালাম সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি; কিন্তু ছালাত কিভাবে? তোমরা বলবে

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল কর, যেমনিভাবে ইব্রাহিম-এর পরিবার বর্গের উপর তুমি রহমত নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এ উপর এবং মুহাম্মাদ-এর পরিবারবর্গের প্রতি বরকত নাযিল কর। যেমনিভাবে বরকত নাযিল করেছ ইব্রাহিমের পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান।[২]

হাদীছে দরূদ পড়ার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর উপর পূর্ণাঙ্গ দরূদ পড়তে হলে দরূদে ইবরাহীম পড়তে হবে যা ছালাতে আত্তাহিয়্যাতুর পর পড়তে হয়। তবে সংক্ষিপ্তভাবে 'ছাল্লাল্লাহু আলা রসূলিল্লাহ ওয়া সাল্লাম' বা 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়া ছহীহ হাদীছ সম্মত। রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে 'আছ্ছলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' পড়া যাবেনা। খারাপ আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তিরা ইসলামের নামে এই ধরণের অপচর্চার করে থাকে যা স্পষ্ট বিদ'আত। আর প্রত্যেকটা বিদ'আতই গোমরাহী এবং গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম। আর সবচেয়ে বড় কথা হল দরূদ হিসাবে এমন কোন বর্ণনা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি। বিধায় তা পরিত্যজ্য।

উল্লেখ্য যে, ছালাতে আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়ু বলায় কোন দোষ নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) থেকে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে।

ছালাতে দরূদ শরীফ পড়া কি ওয়াজীব না সুন্নাত? এ বিষয়ে আলেম-ওলামাদের মাঝে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। জমহুর আলেম-ওলামা ছালাতে দরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত মনে করে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)সহ আরো অনেক ইমামগণ এটি ছালাতে পড়া ওয়াজিব মনে করেন। শুধু তাই নয় চার রাকাআত ছালাতে উভয় বৈঠকেই আত্তাহিয়্যাতুর পরে দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব।

মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, একজন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করে যে, আমরা তো ছালাতের বাইরে আপনার প্রতি সালাম প্রদানের পদ্ধতি জানি। কিন্তু আমরা ছালাতে থাকলে কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠাবো? তখন তিনি সাফ সাফ বলেন যে, তোমরা ছালাতে থাকলে দরূদে ইবরাহীম পড়বে *(ফাৎহুল রাব্বানী ৪/২০-২১ পৃ.)*।

ছহীহ ইবনু হিব্বান, সুনানে কুবরা, বায়হাক্বী, মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে খুযায়মা এবং মুসনাদে আহমাদসহ আরো অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থে এ বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ছালাতে সালাম তথা তাশাহহুদ এবং ছালাত তথা দরূদে ইবরাহীম পাঠ করা দো'আ কবুলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বর্ণনাগুলিতে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে উভয় বৈঠকেই পড়ার ব্যাপারে তাকীদ পরিলক্ষিত হয়। সূরা আহযাবের আয়াতে ছালাত ও সালাম প্রেরণের যে ব্যাখ্যা এসেছে তা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম দিককার ব্যাখ্যা হিসাবে শুধু সালাম প্রেরণের ব্যাপারে বলা হয়েছিল। কিন্তু ৫ম হিজরীর পরবর্তী সময়ে রাসূল (ছাঃ) সালামের সাথে ছালাতের অর্থাৎ তাশাহহুদ এবং দরূদ শরীফ উভয় বৈঠকে পড়ার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেন, হৌক সেটা প্রথম বৈঠক বা দ্বিতীয় বৈঠক। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) একবার নয় রাক'আত বিশিষ্ট এক রাতের ছালাতে অষ্টম রাকা'আতের বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ এবং দো'আ করলেন এবং সালাম না ফিরিয়ে উঠে গেলেন। অতঃপর নবম রাকা'আতে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ এবং পরিপূর্ণ দো'আ পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন।[৩]

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ বলেন, এতে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) রাতে তাহাজ্জুদের নফল ছালাতে উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ এবং দরূদ উভয়টিই পড়েছেন। এটি নফল ছালাতের ঘটনা হলে কি হলো। এটি দ্বারা সর্বত্রই পালনের তাকীদ এসেছে। সুতরাং এটিকে শুধু নফল ছালাতে সীমাবদ্ধ বিধান ভাবাটা ঠিক হবে না।

গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র :

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র একই গণ্য করেন। কিন্তু কুরআনী ব্যাখ্যায় এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মুত্তাকী, পরহেযগার ব্যক্তি মাত্রই প্রচলিত গণতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রকে অধিক কল্যাণকর মনে করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ '(স্মরণ কর) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক নবী এবং তোমাদেরকে (ফেরাঊনী দাসত্বের পর) করেছেন স্বাধীন। আর তোমাদেরকে এমন সব বস্তু (যেমন মান্না ও সালওয়া) দান করেছেন, যা জগদ্বাসীর কাউকে দান করেননি' *(মায়েদাহ ৫/২০)*।

অনেকে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় রাজতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত বলতে চান। আবার অনেকে প্রচলিত গণতন্ত্রকেই জায়েয করতে চান। এখানে উভয় পক্ষই শাব্দিক অর্থের বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছেন। মূলতঃ এর অর্থ হবে إِذْ جَعَلَكُمْ مُلُوكًا 'যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাঊনের সাগর ডুবির পরে নিজ নিজ কর্মে স্বাধীন করে দেন'। বাস্তব কথা এই যে, রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোনটির এখানে ব্যাখ্যার দাবী রাখে না।

তবুও প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় যে, রাজতন্ত্র যদি খারাপ কিছু হত তাহলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কোন নবীকে বাদশাহ বানাতেন না। আর তার নিয়ামতরাজীর গুণকীর্তনেই সবাইকে ব্যস্ত রাখতেন।

২. *বুখারী হা/৪৭৯৭।*

৩. *সুনানে কুবরা লিল বায়হাক্বী ২/৭০৪ পৃ.; সুনানে নাসাঈ ১/২০২ পৃ. নতুন সংস্করণ, কিয়ামুল লাইল অধ্যায়; শায়খ আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নাবী, ১৪৫ পৃ. আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

বর্তমান সময়ে খুবই আফসোস হয় যে, অনেকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পেছনে পড়ে গিয়ে আবোল-তাবোলভাবে এটাকেই ইসলামী শাসনতন্ত্র বলছে, যা ইসলামী সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

তবে বাস্তব কথা এই যে, রাজতন্ত্র মূলতঃ ব্যক্তিতন্ত্র। কেননা ব্যক্তির উপর এ শাসন ব্যবস্থার ভাল মন্দ নির্ভর করে। সেখানে শাসক ভাল বা খারাপ দুই আসতে পারে। তবে যদি শাসক ভাল হয় তাহলে জনগণ এর সুফল পুরো মাত্রাই ভোগ করতে পারে। কিন্তু প্রচলিত গণতন্ত্রের মূলকথা জনগনই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। ফলে ভাল বা মন্দ কোনটাই শাসক ভাল বা খারাপ হ্ওয়ার উপর নির্ভর করে না। বরং ভাল কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় আসলে তাকে পুরোদমে জনপ্রীতি অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। বস্তুতঃ তা কাজে নয়; বরং ভূঁইফোড় কথাবার্তার ফানুস ফাটিয়ে মিথ্যা ছলনার মোহে ফেলে জনগণকে ঠকানোর সব ধরনের রাস্তা আবিস্কার করা হয়। বর্তমান বিশ্বে মিথ্যুক শাসকদের জনগণ দেখছে। যা সবটুকুই প্রচলিত গণতন্ত্রের ফসল।

অনেক মুফাসসির আবার নিমোক্ত আয়াতের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে অগ্রহনীয় মতবাদ এবং প্রচলিত গণতন্ত্রকে একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে বলতে চান। তাদের দলীল, মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ‘আর যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, ছালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে এবং তাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে’ *(শূরা ৪২/৩৮)*।

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ তার প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ আহসানুল বায়ানে এ বিষয়ে সবিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ছালাহুদ্দীন ইউসুফ বলেন, شُورَى শব্দটি ذكري بشري শব্দের মত। যা باب مفاعلة এর মাছদার থেকে এসেছে। অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি বর্গ মাত্রই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পরস্পর পরস্পরে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে করে থাকে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা রাসূল (ছাঃ)-কে মুসলমানদের সাথে শলাপরামর্শ করে কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ‘আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ’তে তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে-ইমরান ৩/১৫৯)*।

বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসে যেতেন। বদর, ওহুদ, খন্দকের মত বড় বড় যুদ্ধগুলো আমাদের সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ মওজূদ রয়েছে।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন বেদ্বীন কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং বেঁচে থাকার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। তখন তিনি রাষ্ট্রীয় খিলাফতের সংকটময় মুহূর্তে ছয় ব্যক্তির পরামর্শ সভায় বসার তাকিদ দিলেন। উছমান, আলী, তালহা, যুবাইর, সাদ এবং আব্দুর রহমান ইবনু আ্ওফের তিনি নাম ঘোষণা করলেন। অনেক মানুষ পরামর্শ সভা বলতে রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটন করে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। যে কোন কাজ করতে গেলে পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে। হতে পারে সেটি শাসনকার্যে বা রাজতন্ত্রে বা অন্য কিছুতে। রাজা বাদশাহরাও অনেক সময় বিভিন্ন কাজে শলাপরামর্শে বসে যান। তাই বলে সবকিছুকেই গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দিতে হবে?

অতএব যদি কেউ উক্ত আয়াত থেকে রাজতন্ত্রকে মূলোৎপাটন করে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান; অথবা গণতন্ত্রকে মূলোৎপাটন করে রাজতন্ত্রকে। তবে সে বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

মূলত আলোচনা পর্যালোচনার মানে হলো জনগন যেন বুঝে যে, বিষয়টির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কেননা বিল্ডিং, জাহাজ ইত্যাদি আমরা যাই বানাই না কেন, আমরা সবকিছুতে কাজের গুরুত্ব বুঝে আলোচনা পর্যালোচনা করে থাকি।

অনেক সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ বিভিন্ন জটিল রোগের সমাধান একাকী করতে পারে না। বিধায় তারা পরামর্শ সভায় বসে যান। সবকিছুতেই যদি শুধু গণতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর থাকেন। তাহলে জণ্ডিসের রোগীর মত সবকিছুকে হলুদ মনে হবে।

আর সবচেয়ে দুঃখজনক হলো ইদানিংকালে খুব জোরেশোরে ইসলামী গণতন্ত্র বলে চিৎকার দেওয়া হচ্ছে। ভাবখানা এই যে, ইসলাম ও গণতন্ত্র একই জিনিস। আফসোস কিভাবে একজন মুসলমান ইসলামী খিলাফতকে কবর দিয়ে কুফুরী গণতন্ত্রকে ইসলামী গণতন্ত্র বলে লেবেল সেঁটে দিতে পারে? এভাবে হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ বাতিল তাফসীর প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

শেষকথা : তাফসীরে আহসানুল বায়ান এমন একটি যুগপোযোগী তাফসীর, যা মুমিন হৃদয়ের পিপাসা মিটাবে। তাফসীরের নামে মিথ্যাচার যেখানেই হয়েছে, সেখানেই তাফসীরে আহসানুল বায়ানের সুদৃঢ় পদচারণা রয়েছে। মুসলিম জীবনে পবিত্র কুরআনের বাইরে যে শিক্ষাই চর্চিত হচ্ছে বা হয়েছে; সে বিষয়ে তাফসীরটির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে। দ্বীনী এবং দুনিয়াবী প্রতিটি বিষয়ই ধরে ধরে আদ্যোপান্ত আলোচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ সম্মানিত মুফাস্সিরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদেরকে পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে বুঝার তাওফীক দিন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

নারীর তিনটি ভূমিকা

-লিলবর আল-বারাদী

(৩য় কিস্তি)

৯. সন্তানের দো'আ পিতা-মাতার নাজাতের অসীলা :

আল্লাহ্র ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও দো'আ করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا - رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(ইসরা ১৭/২৩-২৫)*। অন্যত্র বলেন,أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*।

পিতা-মাতা জন্য দো'আ ছালাতের ভেতরে ও বাহিরে পাঠ করা প্রত্যেক সন্তানের জন্য ওয়াজিব। মানুষ মারা গেলে তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতিত। ঐ তিনটি আমল হ'ল প্রবাহমান দান-ছাদাক্বা, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[১]

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার যেমন করা যায়, অনুরূপ তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব। আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا 'হ্যাঁ (চারটি উপায় আছে)। (১) তাদের জন্য দো'আ করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়'।[২] অন্যত্র এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ. 'সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হ'ল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা'।[৩]

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের দো'আ ও মাগফিরাত কামনা করার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করেন এবং জান্নাতের মর্যাদা উন্নীত করেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে'।[৪] অন্যত্র তিনি বলেন, تُرْفَعُ لِلْمَيِتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ

১. *মুসলিম হা/১৬৩১; আহমাদ হা/৮৮৩১।*
২. *আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিববান হা/৪১৮; হাকেম হা/৭২৬০।*
৩. *মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭; সদন ছহীহ।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।*

لَكَ ‘মানুষের মৃত্যুর পর যখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে’।[৫]

স্ত্রী হিসাবে নারী

আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী :

আদর্শবতী মুমিনা মুসলিমা স্ত্রী হবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালনে সর্বদা প্রস্তুত। অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রীতি থাকবে একনিষ্ঠতার সাথে। দ্বীন অনুসরণে হবে দৃঢ় ও নির্ভিক। আদর্শ নারীর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তারা হবে মুসলিমা, মুমিনা, অনুগতা, সত্যবাদিনী, ধৈর্যশীলা, বিনীতা, দানশীলা, ছিয়াম পালনকারীনী, লজ্জাস্থান হিফাযাতকারীনী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীনী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً – وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ‘অবশ্যই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিমা নারী, মু’মিন পুরুষ ও মু’মিনা নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারীনী নারী, লজ্জাস্থান হিফাযাতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হিফাযাতকারীনী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারীনী নারী - এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু’মিন পুরুষ কিংবা মু’মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট’ *(আহযাব ৩৩/৩৫-৩৬)*। আবার নারী যখন স্বামীর ঘরে স্ত্রী রূপে প্রবেশ করলে যে সমস্ত গুণাবলী অর্জন করা আবশ্যক তা নিম্নে তুলে ধরা হ’ল-

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীলা :

আদর্শবতী স্ত্রী তারাই, যারা প্রথমতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যথাযথ অনুগত্য করে এবং আদেশ-নিষেধ পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। অতঃপর দ্বিতীয়তঃ তারা স্বামীর প্রতি সারাক্ষণ অনুগত থাকতে বাধ্য থাকে। কোন প্রকার ওযর আপত্তি প্রকাশ করে না। যা শারঈ বিধান মতে তা পালনে যথাযথ সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না’ *(হুজুরাত ৪৯/১-২)*।

সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর বিধান কুরআন এবং তারপর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সুন্নাহ্র আনুগত্য করতে হবে। অপরদিকে রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহ্র সান্নিধ্য অসম্ভব। আল্লাহ বিধানদাতা ও রাসূল বিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও পথ প্রদর্শক। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মুমিন ব্যক্তির প্রধান প্রধান গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল’ *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি আরো বলেন, وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ‘আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও’ *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*।

রাসূলের আনুগত্য হ’ল আল্লাহ্র আনুগত্য। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ عَصَى اللهَ ‘যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, সে যেন আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল’।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ’তে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়’।[৭]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং স্বীয় আমল বিনষ্ট করো না’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। তিনি আরো বলেন,

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬; সনদ হাসান।

৬. বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪, ‘কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

৭. বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا 'তুমি বলো, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহ্ফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

প্রত্যেক মানুষের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার সাথে সাথে আমীর বা নেতার আনুগত্য করতে হবে। হোক তা রাষ্ট্র বা সমাজ কিংবা পরিবারের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'হে ইমানদারগণ! মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার আদেশদাতাগণের। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে সেটাকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাকো। এটাই কল্যাণকর ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(আন-নিসা ৪/৫৯)*।

দ্বীনদার নারী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য যথাযথ করে এবং বলে আমরা যা শুনলাম তা মেনে নিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। মূলতঃ তারাই সফলকাম এবং যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কৃতকার্য' *(আন-নূর ২৪/৫১-৫২)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্যকারীনী গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 'হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে কেউ রাসূলের বিরোধীতা করবে এবং ঈমানদারদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলবে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান' *(নিসা ৪/১১৫)*। মেয়েদের বিবাহের পরে স্বামী হ'ল পরিবারের প্রধান নেতা। মেয়েদের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং পরিবারের নেতা হিসাবে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। স্বামীর আদেশ শ্রবণের ক্ষেত্রেও এরা বলে যা আদেশ প্রাপ্ত হলাম তা মেনে নিলাম এবং তা পালনে যত্নবান হয়, যদি তা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী না হয়। এর পরে পিতা-মাতার আনুগত্য করা আবশ্যক।

২. অধিক তাওবাকারী ও বিনয়ী :

তারা এমন আদর্শবতী স্ত্রী হবে, যারা সবসময়ই আল্লাহ্র কাছে নিজের গুনাহ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারীদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। অন্যত্র বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ- 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন' *(শূরা ৪২/২৫)*। তিনি আরো বলেন, أَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'এরপরেও কি তারা আল্লাহ্র দিকে ফিরে তওবা করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মায়েদাহ ৫/৭৪)*।

প্রতিদিন প্রত্যেক মুমিন বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ। আগার আল মুযানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. 'হে মানুষ! আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমিও দৈনিক একশবার তাওবা করি'।[৮] তিনি আরো বলেন, . فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ 'যখন বান্দা গোনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন'।[৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. 'আল্লাহ তা'আলা রাতে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন,

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪; আহমাদ হা/১৭৮৮০।*
৯. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৩০।*

যাতে দিনের গোনাহগার যারা তারা তওবা করে। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গোনাহগার ব্যক্তিরা তওবা করে। এভাবে তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত'।১০

অধিক তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন এবং ভালবাসেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৯৯; মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا. 'যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*। অন্যত্র বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 'জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করো, তোমার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

দিনে ও রাতের অপরাধগুলো ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদের আহ্বান করেন। আবূ যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ. 'হে আমার বান্দারা! তোমরা অপরাধ করে থাক রাতে-দিনে। আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব'।১১ অন্যত্র আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَدْعُونِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. 'কে আছে আমাকে আহ্বান করবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে তা দিবো। আমার কাছে কে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো'।[১২]

তাছাড়া নিজের দুর্বলতা ও পদস্খলনের অনুভূতি সবসময় দংশন করে এবং সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এ ধরনের স্ত্রীর মধ্যে কোন সময়ই অহংকার, গৌরব, অহমিকতা ও আস্তরিতার ভাবধারা জাগতে পারে না। এমন স্ত্রী স্বভাবতই নম্র প্রকৃতির এবং বিনীত মনোভাবের হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ 'মন্দের মুকাবিলা করো যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*।

মহান আল্লাহ নরম হৃদয় ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারীকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ'তে, তবে তারা তোমার আশপাশ হ'তে দূরে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। অন্যত্র বলেন, فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ 'তোমাদের সত্য মা'বুদ একজন মাত্র। সুতরাং তোমরা তাঁরই জন্য অনুগত হও। আপনি বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন' *(হজ্জ ২২/৩৪)*।

কঠোরতা পরিহার করে বিনয়ী হ'তে হবে এবং বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا،وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا 'তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। শান্তি দান করো, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না'।[১৩] বিনয় ও নম্রতা মুমিনের গুণাবলীর অন্যতম মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ 'মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়'।[১৪] অন্যত্র বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ 'যে বান্দাহ আল্লাহ্‌র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন'।[১৫]

আল্লাহর ভালবাসার প্রতীক বিনম্রতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গৃহবাসীকে ভালবাসেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবেশ করান'।[১৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهم 'আল্লাহ কোন গৃহবাসীকে নম্রতা দান করে তাদেরকে উপকৃতই করেন। আর কারো নিকট থেকে তা উঠিয়ে নিলে তারা ক্ষতিগ্রস্থই হয়'।[১৭]

(চলবে)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী

১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৯।*
১১. *মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬; ইবনে হিব্বান হা/৬১৯।*
১২. *বুখারী হা/১১৪৫; আবূদাঊদ হা/১৩১৫; মিশকাত হা/১২২৩;।*
১৩. *বুখারী হা/৬১২৫; মুসলিম হা/১৭৩৪; আহমাদ হা/১২৩৫৫।*
১৪. *তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।*
১৫. *মুসলিম হা/২৫৮৮।*
১৬. *ছহীহুল জামি' হা/৩০৩, ১৭০৪; সিলসিলা ছহীহাহ ২/৫২৩।*
১৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪২।*

সন্তানদের প্রতি উম্মে হাকীমাহ্‌র উপদেশমালা

-অনুবাদ : ড. মুখতারুল ইসলাম

১ম উপদেশ : সাবধান, হে আমার বৎস! মানুষ ও কোন জিনিসের ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রের বিশ্বস্ততা নিশ্চিত না হয়ে কোন ধরনের অপ্রীতিকর মন্তব্য করতে যেও না। প্রতিটি আনীত খবরের খুঁটিনাটি যাচাই বাছাই কর এবং মুখরোচক কথার উপর ভিত্তি করে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নিও না। ব্যক্ত করা প্রতিটি কথা এবং অর্ধেক দেখা কোন বিষয়কে বিশ্বাস করতে নেই। আল্লাহ যখন তোমাকে কোন শত্রুর মোকাবেলায় পেশ করে, তখন তুমি তাকে ইহসানের অস্ত্র ছুঁড়ে মার। মন্দকে সুন্দর আদর্শ দিয়ে প্রতিহত কর। আমি আল্লাহ্‌র কসম কেটে বলতে পারি, তুমি চিন্তাই করতে পারবে না যে, কিভাবে শত্রুতা অসম্ভব রকমের ভালবাসায় পরিণত হয়!

যদি তুমি কোন বন্ধুর ভালবাসার সত্যতা যাচাই করতে চাও, তবে তুমি তার সাথে সফরে বেরিয়ে পড়। তাহলেই তোমাদের মাঝে ভালবাসার হাকীকত সম্পর্কে জানতে পারবে। কেননা সফর প্রকৃতার্থে মানুষের বাহ্যিক বন্ধুত্বের খোলস ছিন্ন করে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্থাৎ বন্ধুত্ব খাঁটি না মেকী তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

২য় উপদেশ : তুমি যদি কোন বিষয়ে সত্যবাদী হও আর মানুষেরা তোমার উপরে সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করে; তোমাকে নিয়ে কটু কথা বলে, তবে তাতে তোমার কোন যায় আসেনা। তুমি তা হাসি মুখে বরণ করে নাও। যখন এই মানুষগুলো প্রকৃত সত্য বুঝতে পারবে, তখন তারাই তোমাকে সফলকাম ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে মেনে নিবে। কেননা মৃত কুকুর কখনও লাথি দিতে পারে না। আর এটাই সত্য যে, ফলদার বৃক্ষেই মানুষেরা ঢিল ছুঁড়ে।

তুমি যখন কারো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হও, তখন মৌমাছির দৃষ্টিতে মৌচাক অবলোকন করবে। মানুষের চোখে মৌচাক অবলোকন করতে যেও না। নইলে দূর্গন্ধময় যমীনে পতিত হবে।

৩য় উপদেশ : রাতে দ্রুত ঘুমাতে যাও। কেননা সকালে রিযিকে বরকত প্রদান করা হয়। আমার ভয় হয় রাতভর জেগে থাকার ফলে তুমি রহমানের প্রদত্ত বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

৪র্থ উপদেশ : আজ আমি তোমার কাছে একটি বকরী ও নেকড়ের গল্প শুনাব। যে তোমার সাথে শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, তাকে বিশ্বাস করো না।

আর যদি কেউ তোমার উপর আস্থা রাখতে চায়, তবে তার বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ো; সাবধান কখনও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

সিংহের গুহায় চল তোমাকে কিছু শিখাই। দেখ, বৎস! সিংহ জঙ্গলে তর্জন-গর্জন করে বলেই তাকে জঙ্গলের রাজা বলা হয় না। বরং তার আত্মমর্যাদাবোধই তাকে এ জায়গায় নিয়ে এসেছে। কেননা যখন সে ক্ষুধার্ত হয়, ভীষণ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করে। তবুও সে অন্যের শিকারের উপরে হামলে পড়ে না।

তুমি খবরদার কারো পরিশ্রমলব্ধ কোন কিছু চুরি করে নিবেনা। নইলে পরে তুমিই সবচেয়ে বড় যালেমে পরিণত হবে।

৫ম উপদেশ : চল হে বৎস! তোমাকে এবার কুশলী গিরগিটি দেখিয়ে নিয়ে আসি। তুমি নিজে চোখেই দেখবে যে, সে কিভাবে অবস্থাভেদে তার রং পাল্টায়। মানুষের মধ্যেও অনেকেই বর্ণচোরা রয়েছে যারা সময়মত তাদের রং বদলায়। সমাজে অনেককে মুনাফিক দেখবে; প্রয়োজনমত নিজের লেবাস পরিবর্তন করে; নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে নিজেকে রং ও লেবাসের আবরণে ঢেকে ফেলে।

হে প্রিয় বৎস! শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোল। তুমি চলতে পার; শুনতে পাও; দেখতে পাও; মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য এটুকুই কি যথেষ্ট নয়? তুমি আল্লাহ্‌র বেশী বেশী শুকরিয়া আদায় কর। কেননা তার প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দাদের আল্লাহ বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

মানুষের প্রতিও তুমি কৃতজ্ঞ হও; তাদের জন্য খরচ কর। দেখবে তাদের নিকট তোমার মানমর্যাদা ও ভালোবাসা অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

৬ষ্ঠ উপদেশ : হে প্রিয় বৎস! আমি আমার জীবনে আবিস্কার করেছি যে, জীবন চলার পাথেয় হিসাবে সততা একটি মহৎ গুণ। অনেক সময় মিথ্যা বলে পার পাওয়া যায়। কিন্তু তদস্থলে সত্যকে আবিস্কারই করাই তোমার জন্য অতি উত্তম ও কল্যাণকর।

৭ম উপদেশ : হে বৎস! প্রতিটি বিষয়ে তোমার বিকল্প কিছুর করার চিন্তা থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে পূর্ণ প্রস্তুতি থাকতে হবে। বিষয়টা যেন এমন না হয় যে, কাউকে সে বিষয়ে অনুরোধ করতে গিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়।

জীবনে প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাও। আজকে সহজভাবে যে সুযোগ পেয়েছ, পরবর্তীতে সেটা নাও পেতে পার। মনে রাখবে, সুযোগ জীবনে বার বার আসে না।

৮ম উপদেশ : জীবনে অভিযোগ এবং বিড়ম্বনায় পড়ে যেওনা। আমি চাই তুমি আশাবাদী হয়ে জীবনকে এগিয়ে

নাও। হতাশাবাদী ও ব্যর্থ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর। সর্বোতভাবে কুসংস্কারচ্ছন্ন ব্যক্তি থেকে সাবধান।

৯ম উপদেশ : কোন ব্যক্তির বিপদে খুশী হয়োনা। কোন লোকের চেহারা আকৃতি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে নেই। কেননা কোন ব্যক্তিই নিজের সৃষ্টিকর্তা নয়। যদি তুমি হাসি ঠাট্টা করেই থাক, প্রকৃতপক্ষে তোমার তামাশা তার সত্তার উপরই বর্তায়, যে সত্তা তাকে আকৃতি দিয়েছেন; সৃষ্টি করেছেন; রং ঢং দিয়ে পরিপাটী করেছেন।

১০ম উপদেশ : কোন মানুষের দোষত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা ঠিক নয়। নয়তো পাছে মহান আল্লাহ তোমার আবাসস্থলেই দোষত্রুটি উন্মোচন করবেন। মনে রেখ, আল্লাহ দোষত্রুটি গোপনকারী। দোষত্রুটি গোপনকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তিনি কারো প্রতি সামান্যতম যুলুম করেন না। যদি তোমার দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হয়, মনে রেখ, মহান আল্লাহ সবার উপরে ক্ষমতাবান।

১১তম উপদেশ : যখন তুমি কারো সাথে আচরণে কঠোরতা অনুভব কর, তখন তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও। তুমি চমকিত হবে কিভাবে এমন হস্ত স্পর্শে হৃদয়ের কঠোরতা ছুয়ে যায় এবং তা হৃদয় থেকে দূরীভূত হয়।

তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ কর। কেননা তর্কবিতর্কে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি মনে হয় যে, বাহাছে আমরা হেরে গেছি, তবে মনে রাখতে হবে, মূলতঃ আমরা আমাদের অহংকারকেই কবর দিয়েছি। আর যদি জিতে যাই, তবে অন্য ভাইয়ের ক্ষতির কারণ হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কেননা একপক্ষ ভাবে, বিজয় লাভ করেছি এবং অপরপক্ষ ভাবে, পরাস্ত হয়েছি।

১২তম উপদেশ : একাকী সব বিষয়ে মতামত প্রদানকারী হয়ো না। বরং কাউকে প্রভাবিত করা এবং প্রভাবিত হওয়ার মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। তুমি যদি কোন বিষয়ে সত্যবাদী হও, অন্যের মতের তোয়াক্কা করো না। প্রভাবিত না হয়ে, নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অটল থাক।

হে আমার বৎস! যাদু বা প্রতারণার আচরণে নয়, বরং মধুময় শব্দ চয়ন এবং মুচকি হাসির ঝলকে মানুষের অজান্তেই তাদের অন্তরে জায়গা করার অদম্য শক্তি তোমায় অর্জন করতে হবে। যাতে করে তাদের উপর তুমি বিশেষ প্রভাব বলয় তৈরী করতে পার। মহান আল্লাহ পবিত্র যিনি মুচকি হাসিকে আমাদের ধর্মে ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছেন এবং এর পুরস্কারও নির্ধারণ করেছেন। চীন দেশে দোকান মালিকদের মুচকি হাসি বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। নচেৎ তাদের দোকান চালানোর অনুমতিই মিলবে না। তোমার সামনে যদি কোন ব্যক্তি মুচকি হাসি না দেয়, তবুও তুমি তার সামনে মুচকি হাসি দিবে। মুচকি হাসিতে যখন তোমার মুখটা হাসিময় হয়ে উঠবে, তখনই ব্যক্তিটির অন্তর বিগলিত হবে এবং তুমি তোমার হাসির প্রতিচ্ছবি তার চেহারায় দেখতে পাবে।

যখন তোমার ব্যাপারে মানুষের মাঝে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠবে, তখন তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর এবং নিজেকে প্রমাণ করার জন্য সকল সন্দেহের উর্ধ্বে নিজের অবস্থান পরিস্কার করবে। অনধিকারচর্চা করতে গিয়ে সব বিষয়ে নাক গলাতে যেওনা। সমাজের মানুষ যেভাবে জীবনের ছন্দ মিলায় সেভাবে ছন্দ মিলাও। হে আমার বৎস! এসব অসহিষ্ণু ও আমার অপসন্দনীয় কর্মকাণ্ড পরিহার করে উন্নত জীবন গঠন কর।

১৩তম উপদেশ : হে আমার বৎস! ঘটনাবহুল জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। মনে রেখ মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিই করেছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এবং তিনি দেখে নিতে চান কে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবরকারী। তবুও কি আমরা ছবর করব না? জীবনের কষ্টগুলো সহজভাবে নাও, হতাশায় মুষড়ে পড়ো না। মনে রেখ, কষ্টের পরবর্তী স্বস্তির জীবন খুবই নিকটবর্তী। কেননা প্রকান্ড মেঘের ঘনঘটার পরই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

১৪তম উপদেশ : অতীতের জন্য দুঃখ করো না। অতীতে যা হওয়ার যথেষ্ট হয়েছে; অতীত তো অতীত। অতীতের ছেলেমানুষী নিয়ে পড়ে না থেকে ভবিষ্যতের বীজ বপন করি।

১৫তম উপদেশ : ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হও, নিজেকে প্রস্তুত কর, ভবিষ্যত বিনির্মাণে জামার হাতা গুটিয়ে নাও। নিজের জীবনের সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠ। নিজেকে গৌরবময় মঞ্চে উপস্থাপন কর। অন্যরা তোমাকে সেভাবেই দেখবে। সাবধান! হীনমন্য ও ছোট ভেবে নিজের জীবনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো না। তুমি বড় স্বপ্ন দেখলে তবেই তো তুমি বড় হবে। তুমি তাদের মত হয়ো না যারা ছোট স্বপ্নের পেছনে পড়ে থাকে এবং অবশেষে জীবনে ছোটই থেকে যায়।

তুমি যদি পুরো দুনিয়ার সংস্কার চাও। আমি তোমাকে বলব যে, আমি তোমার কাছ থেকে এমন আশা করিনি। আর আমি এও আশা করিনি যে, সমস্ত অন্যায়, অপকর্ম থেকে আমরা সকলে মুক্তি পাব। তুমি চিন্তা করে দেখ, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যুকদের অভয়ারণ্যে এ দুনিয়াতে মহৎ ব্যক্তিবর্গ কিভাবে বেঁচে আছে? আমরা কোত্থেকে রিযিক পাচ্ছি? কিভাবে আমরা অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে দুনিয়ায় বসবাস করতে পারছি?

১৬তম উপদেশ : হে আমার বৎস! তুমি যখন আমার পেটে ছিলে, তখন থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তোমাকে আমি প্রতিপালন করে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত করব। আর তুমি আমাকে বলছ, আম্মু আপনি আমার ব্যাপারে এত তাড়াহুড়া করছেন (আমি তো বড়ই হয়নি) কেন? ঠিক আছে ব্যাটা, তুমি এটাও স্মরণ রাখ যে, মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে অলৌকিকভাবে কোন কিছু পেয়ে যায় না। বরং কর্ম দিয়েই নিজের বড়ত্ব অর্জন করে নিতে হয়।

[অনুবাদক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ রাসলান

-আব্দুল হাকীম

বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে এক অনবদ্য বিদ্বান হলেন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ রাসলান হাফিযাহুল্লাহ। মিশরে যারা সালাফী আক্বীদা ও মানহাজকে প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন তিনি তাদের অন্যতম। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম উপস্থাপন করা হলো।

নাম ও জন্ম : ফযীলাতুশ শায়খ মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ ইবনু আহমদ রাসলান আল মাকানী। তিনি ১৯৫৫ সালের ২৩ নভেম্বর মিশরের কায়রো নিকটবর্তী মুনুফিয়্যাহ অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাজীবন : শায়খ রাসলান আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিন এবং সার্জারির উপর স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। সাথে সাথে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আওতাধীন আরবী ভাষা-সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলমুল হাদীছে মুমতায ফলাফলের সাথে প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। তার মাষ্টার্স গবেষণা কর্মের শিরোনাম ছিল ضوابط الرواية عند المحدثين। এরপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডিও সম্পন্ন করেন। তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة।

আক্বীদা : নবী করীম (ছাঃ), তাঁর ছাহাবী, তাবেঈ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ-এর অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের আক্বীদা তথা সালাফে ছালেহীনের অনুসরণে অনড় এক ব্যক্তিত্ব হলেন শায়খ মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ রাসলান। তিনি আক্বীদার ক্ষেত্রে সালাফদের আক্বীদার অনুসরণে এক শক্তিশালী পাহাড়ের ন্যায় সুদৃঢ়। প্রত্যেক যুগে যেমন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ-এর অনুসৃত ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহে দুনিয়ায় থাকেন তিনিও বর্তমানে তাদের মতই এক ব্যক্তিত্ব। নিম্নে তার সংস্কারমূলক দাওয়াতী কার্যক্রমের কিছু প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরা হ'ল :

ক. রাফেযীদের পদস্খলন এবং গোমরাহী নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের সময় রাফেযীরা যে ইহুদীদের পক্ষ নিয়েছে তিনি তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন।

খ. সালাফদের পরবর্তী সময় থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত যারা আক্বীদায় বিভ্রান্ত তিনি তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। যেমন তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা العلمانية ও উদারতাবাদ الليبرالية -এর আলোচনায় বাহাইয়্যাহ (البهائية) ও বাবিয়্যাহ (البابية) দের বিভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি গণতন্ত্র (الديمقراطية) ও হিযবিয়্যাহ (الحزبية) -এর প্রতিরোধ করেছেন বিশুদ্ধ আক্বীদার মাধ্যমে। বিশেষতঃ তিনি শী'আ ও রাফেযীদের প্রকৃত চেহারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর আক্বীদার মাধ্যমে জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যাতে করে জনগনের নিকটে তাদের বিভ্রান্তি স্পষ্ট হয় এবং সালাফদের আক্বীদা তাদের গ্রহণ করতে সহজ হয়।

মানহাজ : শায়খ মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ রাসলান সালাফী মানহাজের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও একজন নির্ভরযোগ্য দাঈ। তাঁর বক্তব্য, লেখনী এবং দারসের বদৌলতে সারাবিশ্বে অনলাইনের মাধ্যমে সালাফী দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার এক অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি সাইয়েদ কুতুব এবং তাঁর বইসমুহ, তাঁর মতবাদ খণ্ডন করে অনেক বই লিখেছেন এবং সাইয়েদ কুতুবের মতবাদকে দলীল ভিত্তিক বাতিল প্রমাণ করেছেন। তাঁর সালাফী মানহাজের দাওয়াহ সম্পর্কে ফযীলাতুশ শায়খ সুহায়মী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 'মহান আল্লাহ্র প্রশংসা আমি তাঁকে চিনি। তাঁর দ্বারা সালাফী দাওয়াতের বিশাল খেদমত মহান আল্লাহ কবুল করেছেন। তাঁর দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু হলো আল কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। আমি জানি দূর দুরান্তের অনেকেই তাকে চেনে না। কেননা তিনি সাদাসিধে জীবন যাপনকেই পসন্দ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর দূরদৃষ্টি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এজন্য যখনই তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ-এর নামে যেখানেই বিভ্রান্তি দেখতে পান তিনি উত্তম পন্থায় তার খণ্ডন করেন। আর এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর গণতন্ত্রী এবং হিযবীদের খণ্ডন। মোটকথা - তিনি আল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল ভিত্তিক জারহ ওয়া তা'দীল এবং ইলম ও আদবের সমন্বয়ে খণ্ডন করেন।

উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহ : শায়খ রাসলান বক্তব্য এবং দারসের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকেন। তাঁর অনেক মৌলিক কিতাবের দারস রয়েছে। তিনি একাধারে তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীছ, উসূলে হাদীছ, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, আক্বীদা, মানহাজ, ফারায়েয, সীরাত প্রভৃতি বিষয়ে দারস দিয়েছেন। এসব বিষয় সামনে রেখেই তিনি প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রদত্ত হ'ল :

১. ফাযলুল ইলমী ওয়া আদাবু তলাবাতিহি ওয়া তুরুকু তাহসীলিহি ওয়া জামঈহি (فَضْلُ الْعِلْمِ وَآدَابُ طَلَبَتِهِ وَطُرُقُ تَحْصِيلِهِ وَجَمْعِهِ) ।

২. দাআইমু মিনহাজিন নুবুওওয়্যাহ (دَعَائِمُ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ) ।

৩. যওয়াবিতুর রিওয়ায়াতি ইন্দাল মুহাদ্দিছীন (ضَوَابِطُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ) এটা তিন খন্ডে প্রকাশিত মাষ্টার্স থিসিস।

৪. আর রুওয়াতুল মুবাদ্দিঊনা মিন রিজালিল কুতুবিস সিত্তাহ (الرُّوَاةُ الْمُبَدَّعُونَ مِنْ رِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ) এটা তার পিএইচডি থিসিস। যা চার খন্ডে প্রকাশিত।

৫. ফাযলুল আরাবিয়্যাহ ওয়া উজুবু তাআল্লুমিহা আলাল মুসলিমীন (فَضْلُ الْعَرَبِيَّةِ وَوُجُوبُ تَعَلُّمِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ)।

৬. শারহু উসূলিস সুন্নাহ লিল ইমাম আহমাদ (شَرْحُ أُصُولِ السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ)। দুই খন্ড।

৭. শারহু কিতাবিল আদাবিল মুফরাদ (شَرْحُ كِتَابِ الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ)

৮. শারহু তাতহীরিল ই'তিকাদ লিস সন'আনী।

৯. শারহু মুযাক্কিরাতিত তাওহীদ লিল আল্লামাহ আব্দুর রাজ্জাক আফীফী।

১০. আল ওয়াযঊ ফিল হাদীস ওয়া জুহুদুল ওলামাই ফী মুওয়াজাহাতিহ (الْوَضْعُ فِي الْحَدِيثِ وَجُهُودُ الْعُلَمَاءِ فِي مُوَاجَهَتِهِ)।

১১. যওয়াবিতুল কিতাবাহ ইন্দাল মুহাদ্দিছীন।

১২. আদাবু ত্বলিবিল ইলম (آدَابُ طَالِبِ الْعِلْمِ)।

১৩. যাম্মুল জাহলি ওয়া বায়ানু ক্বাবীহি আছারিহ (ذَمُّ الْجَهْلِ وَبَيَانُ قَبِيحِ أَثَرِهِ)।

১৪. আত তারহীব মিনার রিবা (التَّرْهِيبُ مِنَ الرِّبَا)।

১৫. তাহযীবু শারহি আক্বীদাতি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ লি ইবনি উছাইমীন।

১৬. মাওকিফুস ছাহাবাহ মিন রিওয়ায়াতিল হাদীছ।

১৭. আহাম্মুল মুছান্নাফাত ফী ইলমির রিওয়ায়াহ।

১৮. শারহুল কাওয়াইদিল আরবা' (شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعِ)

১৯. শুরূতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া নাওয়াকিযুল ইসলাম।

২০. কিরাআতুন ওয়া তা'লীকুন ওয়া তাখরীজুন লিরিসালাতি শায়খিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ আল উবূদিয়্যাহ।

২১. কিরাআতুন ওয়া তা'লীকুন ওয়া তাখরীজুন লিরিসালাতি শায়খিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ আল আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহয় আনিল মুনকার।

২২. তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীকী আলা শারহিল উসূলিস সুন্নাহ লি ইবনি উছায়মীন।

বিনয় ও নম্রতা : শায়খ মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ রাসলান চাল চলন ও আচার-আচরণে এক অনুপম ব্যক্তিত্ব। তাঁর নম্রতা ও ভদ্রতা সবার জন্য অনুপম দৃষ্টান্ত। সালাফদের যেমন যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা ছিল, তেমনই যুহদ তার মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যখনই ছাত্রদের সাথে মিলিত হন তিনি নিজেই সালাম প্রদান করেন ছাত্র যত ছোটই হৌক না কেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ইলমী ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও এখনো তালেবুল ইলমদের ন্যায় চলাচল করতে পসন্দ করেন। প্রশংসার জোয়ারে ভাসতে কিংবা বড়ত্ব ও আমিত্ব কোথাও যেন পরিলক্ষিত না হয় এজন্য তিনি সদা সচেষ্ট থাকেন। এছাড়া তার উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হ'ল তিনি বক্তব্য ও দারসের সময় ক্বিয়ামত ও আখেরাতের ভীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে অনেক কান্না করেন। যেমন তার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী (بين الحياة والممات) এবং নির্জনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অন্তরকে সুরক্ষা প্রদান (رقابة السر ورعاية الضمير) বক্তব্যটি একারণে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

শায়খ সম্পর্কে বিদ্বানদের মন্তব্য : শায়খ রাসলান সম্পর্কে বর্তমান সময়ের নির্ভরযোগ্য অনেক বিদ্বান গ্রহণযোগ্য মন্তব্য করেছেন। যার মাধ্যমে শায়খের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন :

ক. আল্লামা হাসান ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, মিশরে যারা সালাফী দাওয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁরা হলেন শায়খ 'আলী হাশীশ, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ রাসলান (হাফিঃ)।

খ. শায়খ ড. ফালাহ ইবনু ইসমাঈ মান্দাকার (রাহিঃ) বলেন, 'আমি শায়খের সান্নিধ্যে থাকা, তাঁর দারস শ্রবণ করা এবং তাঁর থেকে ফায়দা গ্রহণ করার নছিহত করছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি সুন্নাহ, সালাফিয়্যাহ ও শারঈ শিষ্টাচারের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি একজন দুনিয়াবিমুখ পরহেযগার মানুষ। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ও তাঁকে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখেন এবং আমাদেরকে ও তাঁকে (সৎকর্মের) তাওফীক্ব দান করেন'।

তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের জন্য আকাবির তথা বড়দের আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। আল্লাহ্র রহমতে মিশরে তোমাদের কাছে আছেন শায়খ হাসান ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আল-বান্না এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ রাসলান। তোমাদের জন্য এই বড়দের আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। তাঁদের কাছে ভাইদের একত্রিত করো এবং তোমাদের সমস্যাগুলো এই বড়দের কাছে উপস্থাপন করো। বড়দের দিকে ফিরে যাওয়ার মধ্যে বিরাট কল্যাণ এবং মহান উপকারিতা রয়েছে'।

গ. ফযীলাতুশ শায়খ সুলাইমান ইবনু সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (হাফিঃ)-কে মিশরের কোন শায়খের দারসে উপস্থিত হওয়া যাবে মর্মে প্রশ্ন করা হলে তিনি শায়খ রাসলানের দারসে বসায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং বলেন, 'আমি শায়খ রাসলানকে চিনি তাঁর বক্তব্য শোনার মাধ্যমে। তিনি স্বীয় আক্বীদাহ ও মানহাজে শক্তিশালী ব্যক্তি'।

এছাড়া শায়খ মুহাম্মদ ইবনু রাবী ইবনু হাদী আল মাদখালী, শায়খ আহমাদ ইবনু ওমর বাযমুল, শায়খ সা'দ আল হুসাইন, শায়খ আহমাদ সালিম সহ প্রমুখ সালাফী বিদ্বান তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি তিনি যেন শায়খ রাসলানকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করেন। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সালাফী মানহাজের একজন একনিষ্ঠ রাহবার হিসাবে কবুল করেন- আমীন!

[লেখক : শিক্ষার্থী, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়]

কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যে অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ

[লন্ডনের অধিবাসী ঈসা মাত্র ১৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে। ১০ বছর বয়সে এক চাচাতো বোন তাকে ইসলাম ও কুরআনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কুরআনে বর্ণিত মাতৃগর্ভে শিশুর বেড়ে ওঠা, নক্ষত্র, সাগরবিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য যা আধুনিক বিজ্ঞানও সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে তাকে বিস্মিত করে। তিন বছরের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর ইসলাম গ্রহণ করে সে। অ্যাবাউট ইসলামে তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ লিখেছেন সেলমা কুক এবং ভাষান্তর করেছেন মোঃ আবদুল মজিদ মোল্লা]

ঈসা মাত্র ১৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে। কুরআনের বৈজ্ঞানিক নিদর্শন তাকে ইসলামে আকৃষ্ট করে। এর আগে তার এক চাচাতো বোন মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তখন ঈসার বয়স ১০ বছর এবং সে স্কুল শিক্ষার্থী। তার সেই চাচাতো বোন প্রথম তাদের পরিবারকে ইসলাম সম্পর্কে জানায়। তার অভ্যাস ছিল ঘরে ফিরে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা। পরিবারের সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে ঘরে তুমুল বিতর্ক হতো। তবে ঈসা বিতর্ক থেকে দূরে থাকত এবং শুধু তা শুনে যেত। একদিন তার চাচাতো বোন তাকে ঘরে ডেকে নিল এবং কুরআন দেখিয়ে জানতে চাইল, সে কুরআন

সম্পর্কে কিছু জানে কি না? ঈসা বলল, সে জানে না। চাচাতো বোন বলল, এটা বাইবেলের মতোই; মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ। এরপর জানতে চাইল, ঈসা মুসলিমদের সম্পর্কে কিছু জানে কি না? সে জানালো, না। কেননা মায়ের কাছ থেকে খ্রিস্টানদের সম্পর্কে জানা বিষয়গুলোর বাইরে ধর্ম বিষয়ে তার কোনো ধারণা ছিল না। তার চাচাতো বোন তার সঙ্গে মহান আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করল এবং বলল, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কুরআন লাভ করেছেন।

কুরআনের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক নিদর্শন ও ব্যাখ্যা ঈসার মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইসলাম গ্রহণকারীরা ইসলামের আধ্যাত্মিক শান্তি ও সৌন্দর্যের যে বর্ণনা দেয় তার কাছে তা ছিল কেবল পরিসংখ্যান। তাকে বিস্মিত করেছিল মাতৃগর্ভে শিশুর বেড়ে ওঠা, নক্ষত্র, সাগর ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য। আধুনিক বিজ্ঞান যা সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তার জানা মতে, এত আগে নক্ষত্র ও মহাকাশ সম্পর্কে বলা কোনো মানুষের বক্তব্য এতটা নির্ভুল ছিল না। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়, খাদ্যবিধি, পোশাকবিধি অনুসরণ করা তার জন্য কঠিন মনে হয়নি। ঈসার চাচাতো বোন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জানানোর পর সে সিদ্ধান্ত নেয় একেক সময় একেক বিষয়ে মনোযোগ দেবে। সর্বপ্রথম ছালাত শেখার সিদ্ধান্ত নেয়। তাকে আরবী, অনুবাদ ও সচিত্র ছালাত শিক্ষার একটি বই দেওয়া হ'ল।

ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রথমেই সে কাউকে বলল না। কেননা সে মানুষের মন্তব্য ও সমালোচনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাছাড়া ইসলামের প্রকৃতি ও তার শিক্ষা সম্পর্কেও তার জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল না। ঈসা জোর দিয়ে বলেছে, মিসর ও ইয়েমেনে ভ্রমণের সময় সে ইসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহু কিছু শেখে। এরপরও ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তার ও চাচাতো বোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। ইসলামী বইয়ের দোকান থেকে তাওহীদ, ছালাত, ছিয়াম, মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনী বিষয়ক বই সংগ্রহ করে। এরপর সে তিন বা চার মাস পর দক্ষিণ লন্ডনে অবস্থিত আব্দুর রহমান গ্রীনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই অনুপ্রেরণামূলক বৈঠক থেকেও সে অনেক কিছু শেখে। একজন উঠতি বয়সী মুসলিম হিসাবে স্কুল ও কলেজে ঈসা সমস্যার মুখে পড়েনি। কিন্তু স্কুলের সময় বা কোনো কোলাহলপূর্ণ জায়গায় যখন ছালাতের প্রস্তুতি হিসাবে অযু করত বা পরবর্তী ছালাতের সময় হিসাব করত, তখন তার মনের ভেতর উদ্বেগ কাজ করত।

১৫ বছর বয়সে ঈসা ইসলাম প্রচারে যোগ দেয়। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার এক বন্ধু ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তাদের নিজস্ব একটা জগৎ তৈরী হয়। স্কুল থেকে শুক্রবার জুমআর জামাতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তারা দুই বন্ধু একসঙ্গে সমস্যায় পড়ে। বয়স অল্প হওয়ার পরও ঈসার কাছে ইসলাম ধর্মকে কঠোর মনে হয়নি; বরং সে ইসলামী বিধানের যৌক্তিকতাই খুঁজে পেতেন। ইসলামে মদ নিষিদ্ধ। ঈসা চিন্তা করত মানুষের মদ পান করা উচিত নয়, কেননা তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অমুসলিম বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্কও খারাপ ছিল না। তবে তাদের সঙ্গে সে বাইরে যেত না। কোনো অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যেত। এভাবে সে ধীরে ধীরে ইসলামের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করে এবং একজন দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে পরিণত হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

[সূত্র : ইন্টারনেট]

মুসলিম জীবনে হিজরী সনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

- যহুরুল ইসলাম

আমরা দিন দিন যত আধুনিক হচ্ছি, আমাদের ভিতর থেকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেতনাবোধ ততোটাই হারিয়ে যাচ্ছে। অপসংস্কৃতির ছোবল থেকে বাঁচা বড় দায় হয়ে গিয়েছে। শারঈ বিধান এবং ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চেয়েও আমাদের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে উঠেছে পশ্চিমা বস্তাপচা সংস্কৃতি। আমাদের জীবনে অন্যতম মূল্যায়নযোগ্য বিষয় হ'ল সময় তথা দিন-তারিখ ও বছর গণনা।

কারণ, সময়ের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের গৌরবময় ইসলামী ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, আনন্দ-উৎসব এবং আমাদের মূল্যবান ইবাদত বন্দেগী। এজন্য প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের লক্ষ্য করা উচিত, যেন এই মূল্যবান সময়ের গণনা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর সম্মানিত রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় হয়। কিন্তু বিশ্বের সিংহভাগ মুসলমান দিন-তারিখ গণনার ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতায় বুঁদ হয়ে আছে। সেকারণ, মুসলিম জীবনে দিন-তারিখ গণনায় ইসলামী পদ্ধতি কী এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

মুসলমানদের জীবনে দিন-তারিখ ও বছর গণনা হবে চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী :

মানবজীবন সময়ের সমষ্টি। সময়কে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারোপযোগী করে আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন দিন, রাত, মাস, বছর ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ'ল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হ'ল 'হারাম' (মহাসম্মানিত)। এটিই হ'ল প্রতিষ্ঠিত বিধান। অতএব এ মাসগুলিতে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না। আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে থাকেন' *(তাওবা ৯/৩৬)*। তদুপরি মহান আল্লাহই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে আমরা এই বারোটি মাসের গণনা করবো।

মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে করেছেন কিরণময় ও চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময় এবং ওর গতির জন্য মনযিল সমূহ নির্ধারণ করেছেন। যাতে তোমরা বছরের গণনা ও সময়ের হিসাব করতে পার। আল্লাহ এগুলিকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিদর্শন সমূহ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য' *(ইউনুস ১০/৫)*।

তাফসীরে আল্লামা ইমাম বাগাভী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ তাফসীরে বাগাভীতে উল্লেখ করেছেন, বারো মাস হ'ল- মুহাররম, ছফর, রবীউল আউয়াল, রবীউল আখের, জমাদিউল উলা, জমাদিউল আখেরাহ, রজব, শা'বান, রামাযান, শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ। আর হারাম বা সম্মানিত চারটি মাস হ'ল- মুহররম, রজব, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ।[১]

মুহাররম : মুহাররম-এর অর্থ হ'ল পবিত্র, সম্মানিত। যেহেতু এটি হারাম মাসের একটি। তাই একে মুহাররম হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

ছফর : ছফর শব্দের অর্থ খালি হওয়া। কেননা হারাম মাস মুহাররমের পরে সবাই ঘর ছেড়ে যুদ্ধে বের হত, তাই একে ছফর বা খালি নামে নামকরণ করা হয়েছে।

রবীউল আউয়াল, রবীউল আখের : এ দুই মাস নামকরণের সময় রবী' তথা বসন্তকালে এসেছে। তাই এ দুই মাসকে প্রথম বসন্ত ও শেষ বসন্ত অর্থাৎ রবীউল আউয়াল ও রবীউল আখের বলা হয়।

জমাদিউল উলা, জমাদিউল আখেরাহ : জমদ শব্দের অর্থ হ'ল, বরফ জমাট বাধা। যেহেতু এ দুইমাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়া হওয়ার কারণে বরফ জমাট বাধে, তাই মাস দ্বয়কে জমাদিউল উলা ও জমাদিউল আখেরাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রজব : রজব শব্দের অর্থ সম্মান করা। এ মাসকে সম্মান করে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকা হয়, তাই এ মাসকে রজব নামে নামকরণ করা হয়েছে।

শা'বান : এর অর্থ হ'ল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। যেহেতু হারাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকার পর আরবরা শা'বান মাসে আবার তাদের আক্রমণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হত, তাই একে শা'বান নামে নামকরণ করা হয়েছে।

রামাযান : রময শব্দের অর্থ-দগ্ধ হওয়া। রামাযান মাসে গরমের প্রচণ্ডতার কারণে এ মাসকে রামাযান নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ মাসের নাম মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ আছে।

শাওয়াল : শাওয়াল শব্দের অর্থ কমে যাওয়া। যেহেতু সে সময়ে আরবদের উটের দুধ নানা কারণে কমে যেত। তাই এ মাসকে শাওয়াল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

যিলক্বদ : ক্বা'দা শব্দের অর্থ বসে থাকা। সম্মানিত ও হারাম মাস হওয়ার কারণে আরবরা যুদ্ধ বিগ্রহে না গিয়ে বসে থাকত। তাই একে যিলক্বদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

যিলহজ্জ : যিলহজ্জ শব্দের অর্থ হজওয়ালা। যেহেতু এ মাস হজ্জের মাস। তাই একে যিলহজ্জ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, চন্দ্র মাস গণনা তথা হিজরী সন গণনা করা শারঈ বিধান ও মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরণ।

---

১. *তাফসীরে বাগাভী ৪/৪৪ পৃ.।*

চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী গণনা হওয়ার যৌক্তিকতা :

ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিন-তারিখগুলোকে খৃষ্টীয় সন-তারিখে রূপান্তরিত করে পালন করা বা স্মরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা বা উপকারিতা নেই।

কারণ এসব ঘটনা যেসব মাস বা দিনে হয়েছে সেগুলোর আলাদা তাৎপর্য আছে। যেমন বদর যুদ্ধের দিনের কথা বলতে পারেন। যুদ্ধটি হয়েছে রামাযান মাসে। কুরআন নাযিলের মাসে। এখন এ যুদ্ধদিনের তারিখকে খৃষ্টীয় সনে অনুসরণ করে স্মরণ করলে একসময় দেখা যাবে দিনটি আর রামাযান মাসে নেই। তখন এ যুদ্ধের ইতিহাসের যে আবেদন রয়েছে, তা কিছুটা হারিয়ে যাবে। তাই এ জাতীয় ঘটনা ও দিবসকে হিজরী সন ও তারিখ দিয়েই গণনা করা উচিত। তবে হিজরী সন ঠিক রেখে কেউ যদি এর সঙ্গে খৃষ্টীয় সনকে মিলিত করে উল্লেখ করেন, সেটা দোষণীয় নয়।

আসলে ইসলাম হচ্ছে দ্বীনুল ফিতরাহ বা স্বভাব-অনুকূল ধর্ম। ইসলামের বিধিবিধান এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, সমতলবাসী বা পাহাড়ী, তথ্য ও প্রযুক্তির সুবিধাপ্রাপ্ত ও বঞ্চিত-সবাই যেন স্বাচ্ছন্দে আল্লাহ্র বিধিবিধানগুলো পালন করতে পারে। চাঁদের মাস ও বছরের হিসাবেই খুব সহজে সম্ভব। জোতির্বিদ্যা বা আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য যাদের কাছে থাকে না তারাও চাঁদ দেখে স্বাচ্ছন্দ্যে এ বিধানগুলো পালন করতে পারে।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, চন্দ্রবর্ষের হিসাব অনুযায়ী হওয়ায় একটি ইবাদত বিভিন্ন মৌসুমে পালনের সুযোগ মুসলমানরা পান। কখনও ছিয়াম ছোট দিনের হয়, কখনও দীর্ঘ দিনের। কখনও ঈদ ও হজ্ব হয় শীতকালে, কখনও গ্রীষ্মকালে। মৌসুমের এই বৈচিত্র্যের কারণে মুসলমানরা একটি ইবাদত বা উৎসব আল্লাহ্র দেওয়া সবক'টি মৌসুমেই পালন করতে পারেন।

চন্দ্রবর্ষ বা হিজরী সন সূচনার ইতিহাস :

ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক বাহক চন্দ্রবর্ষটি বিক্ষিপ্ত ভাবে গণনা শুরু হয় স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে।

তখন আরবে সুনির্দিষ্ট কোনো সাল প্রচলিত ছিল না। বিশেষ ঘটনার নামে বছরগুলোর নামকরণ করা হত। যেমন বিদায়ের বছর, অনুমতির বছর, হস্তীর বছর, আমুল হুযন অর্থাৎ দুঃখের বছর ইত্যাদি। তবে সুশৃঙ্খল ও কাঠামোগত অবয়বপ্রাপ্ত হয় রাসূল (ছাঃ) এর ওফাতের সাত বছর পর, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে। ১৭ হিজরী মোতাবেক ৫৩৮ মতান্তরে ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) যখন খলীফা হন, তখন অনেক নতুন ভূখণ্ড ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র ইত্যাদিতে সাল-তারিখ উল্লেখ না থাকায় অসুবিধা হত। তখন এর গুরুত্ব বোঝার পর হিজরী সন গণনা শুরু হয়। এর প্রেক্ষাপট ছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় চিঠি আসত। সেখানে মাসের নাম ও তারিখ লেখা হত। কিন্তু সনের নাম থাকত না। এতে বিভ্রান্তি র সৃষ্টি হত। তখন পরামর্শের ভিত্তিতে একটি সন নির্ধারণ ও গণনার সিদ্ধান্ত হয়। বিভিন্ন উপলক্ষ থেকে সন গণনার মতামত আসলেও শেষ পর্যন্ত হিজরতের ঘটনা থেকে সন গণনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐতিহাসিক আলবিরুনির বিবরণী থেকে জানা যায়, হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) একটি পত্রে উমর (রাঃ)-কে অবহিত করেন, সরকারী চিঠিপত্রে সন-তারিখ না থাকায় আমাদের অসুবিধা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে হযরত ওমর (রাঃ) একটি সাল চালু করেন।

আল্লামা শিবলি নোমানী (রাঃ) হিজরী সালের প্রচলন সম্পর্কে 'আল-ফারূক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে ১৬ হিজরী সালের শা'বান মাসে খলীফা ওমরের কাছে একটি দাপ্তরিক পত্রের খসড়া পেশ করা হয়, পত্রটিতে মাসের উল্লেখ ছিল; সালের উল্লেখ ছিল না। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, পরবর্তী কোনো সময়ে তা কীভাবে বোঝা যাবে এটি কোন সালে পেশ করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে হযরত ওমর (রাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞানী-গুণীকে নিয়ে আলোচনা করে মহানবী (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের বছর থেকে সাল গণনা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। হিজরতের বছর থেকে সাল গণনার পরামর্শ দেন হযরত আলী (রাঃ)। পবিত্র মুহাররম মাস থেকে ইসলামী বর্ষ হিজরী সালের শুরু করার ও যিলহজ্জ মাসকে সর্বশেষ মাস হিসাবে নেওয়ার পরামর্শ দেন হযরত ওছমান (রাঃ)।

হিজরতের বছর থেকেই সন গণনার তাৎপর্য :

রবিউল আউয়াল মাসই হিজরী সালের প্রথম মাস হওয়া উচিত ছিল। কেননা এ মাসেই রাসূল (ছাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন; কিন্তু রবিউল আওয়ালের পরিবর্তে মুহাররম মাসকে প্রথম মাস এজন্যে করা হয় যে রাসূল (ছাঃ) মুহাররম মাস থেকেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। মদীনার আনছারগণ দশই যিলহজ্জ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং যিলহজ্জের শেষ তারিখে তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাদের প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং ছাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন। এ কারণে মুহাররমকে হিজরী সনের প্রথম মাস করা হয়েছে। এছাড়া ওছমান এবং আলী (রাঃ) পরামর্শ দেন যে হিজরী সনের সূচনা মুহাররাম মাস থেকেই হওয়া উচিত। কেউ কেউ বললেন, রামাযানুল মুবারক থেকেই বছরের সূচনা হওয়া উচিত। ওমর (রাঃ) বললেন, মুহাররম মাসই উপযুক্ত মাস। কারণ হজ্জ থেকে মানুষ মুহাররম মাসেই প্রত্যাবর্তন করে। এর ওপরই সবাই একমত হন'।[২]

আবার কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন, সন গণনার আলোচনার সময় প্রস্তাব উঠেছিল, ঈসায়ী সনের সূচনার সঙ্গে মিল রেখে নবীজীর জন্মের সন থেকে ইসলামী সনের শুরু হোক। এ রকম আরও কিছু কিছু উপলক্ষের কথাও আলোচিত হয়। কিন্তু হিজরতের সন থেকে সন গণনা চূড়ান্ত হওয়ার পেছনে তাৎপর্য হল, হিজরতকে মূল্যায়ন করা হয় 'আল ফারিকু বাইনাল হাক্কি ওয়াল বাতিল' অর্থাৎ সত্য-

২. *বাবুত তারীখ, ফাৎহুল বারী, ৭/২০৯, তারীখে তাবারী, ২/২৫২, যারকানী, ১/৩৫২, উমদাতুল কারী, ৮/১২৮।*

মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী বিষয় হিসাবে। হিজরতের পর থেকেই মুসলমানরা প্রকাশ্য ইবাদত ও সমাজ-গঠনের রূপরেখা বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। প্রকাশ্যে আযান, ছালাত, জুম'আ, দুই ঈদ সবকিছু হিজরতের পর থেকেই শুরু হয়েছে। এসব তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করেই মুসলমানদের সন গণনা হিজরত থেকেই শুরু হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

মুসলিম জীবনে হিজরী সনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্র সভ্যতা-সংস্কৃতিতে হিজরী সালের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মুসলিম জীবনে হিজরী সনের গুরুত্ব ও তার কারণ আলোকপাত করা হ'ল।

ক. যেসব ক্ষেত্রে চন্দ্রবর্ষ বা হিজরী সনের প্রভাব :

এই চন্দ্রবর্ষের ও চান্দ্রমাসের প্রভাব মুসলমানদের জীবনে ব্যাপক। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত ইবাদতের তারিখ, ক্ষণ ও মৌসুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে হিজরী সনের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে হিজরী সনের হিসাব স্মরণ রাখা মুসলমানদের জন্য যরূরী। যেমন রামাযানের ছিয়াম, দুই ঈদ, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ক্ষেত্র গুলোতে চন্দ্রবর্ষ বা হিজরী সন ধরেই আমল করতে হয়। ছিয়াম রাখতে হয় চাঁদ দেখে, ঈদ করতে হয় চাঁদ দেখে।

এভাবে অন্যান্য আমলও। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলাদের ইদ্দতের ক্ষেত্রগুলোতেও চন্দ্রবর্ষের হিসাব অনুযায়ী গণনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মীয় কতগুলো দিন-তারিখের হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলোতে চাঁদের হিসাবে দিন, তারিখ, মাস ও বছর হিসাব করা আবশ্যকীয়।

খ. হিজরী সন বা ইসলামী সনকে স্মরণ রাখা ও অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা :

শুধু হিজরী সন নয়, হিজরী সনের মাসগুলোর তারিখ ব্যবহারে ও চর্চায় রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। মুসলমানদের হিসাব-নিকাশগুলো হিজরী তারিখ উল্লেখ করেই করা উচিত। অন্য সনের হিসাব অনুগামী হিসাবে আসতে পারে।

মনে রাখতে হবে, ইসলামী তারিখ বা চান্দ্রবর্ষের হিসাব রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য ফরযে কেফায়া। একথা মনে করার কোনোই অবকাশ নেই যে, হিজরী সনটি আসলে আরবী বা কেবল আরবদের একটি সন; বরং এটি মুসলমানদের সন এবং ইসলামী সন। এক্ষেত্রে শুধু একটা চাঁদ দেখা কমিটি করে একটি মুসলিম-রাষ্ট্রের দায়িত্ব পুরোপুরি পালিত হয় না। বরং সব মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রের উচিত, তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে ইসলামী বা হিজরী সনকে প্রাধান্য দেওয়া।

মুসলিম জীবনে হিজরী সনের গুরুত্ব :

ক. আল্লাহ্র আদেশ : হিজরী সন হ'ল চন্দ্র মাস। আর আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে সময় নির্ধারণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশের প্রতি সম্মানার্থে হিজরী সন গণনা করা অপরিহার্য্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, লোকেরা আপনাকে নবচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, তা হ'ল মানুষের এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ধারণকারী। *(বাক্বারাহ ২/১৮৯)* এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের হিসাব-নিকাশের সুবিধার্থে পঞ্জিকাস্বরূপ চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য চন্দ্র মাস তথা হিজরী সনের গুরুত্ব অপরিসীম।

খ. আল্লাহ্র নিদর্শন : মহান আল্লাহ চন্দ্র মাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন, আমি রাত ও দিনকে করেছি দৃষ্টি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকজ্জ্বল করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে সক্ষম হও এবং রাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যাও হিসাব করতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করছি। এ আয়াত থেকে উপলব্ধি করা যায় যে আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ স্বরূপ তাঁর বান্দাদের সাল গণনা ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশের জন্য দিন-রাতকে সৃষ্টি করেছেন।

গ. রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর অনন্য স্মৃতিচারণ :

হিজরী সাল গণনা করা হয় রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ফলে হিজরী সন ব্যবহার ও গণনার ফলে রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সেই হিজরতের ঘটনা মুসলিম হৃদয়ে বার বার দোলা দেয়।

আবার স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতদের নির্দেশ দিয়ে বলছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার কর'।[৩]

ঘ. ইবাদত-বন্দেগী আদায় :

ইসলামের অধিকাংশ ইবাদত-বন্দেগী যেমন: ছিয়াম, হজ্জ, কুরবানী, শবে-কদর, আশুরা ইত্যাদি ইবাদত হিজরী সনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ফলে হিজরী সনের ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ইবাদত করা সম্ভব হয়। এজন্য তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে, হিজরী সন তথা চন্দ্রমাস গণনাকে ফরযে কেফায়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ঙ. খোলাফায়ে রাশেদার অনুকরণ :

হিজরী সন হ'ল ওমর (রাঃ)-এর শাসন আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত। আর রাসূল (ছাঃ) তাঁর এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা'।[৪]

চ. মুসলিম ঐতিহ্যের অনুকরণ :

হিজরী সন গণনা ইসলামী সংস্কৃতির অনুসরণ। এজন্য চন্দ্র মাস হিসাবে হিজরী সন গণনা করা মুসলমানদের জন্য কর্তব্য। হিজরী সন ইসলামী ঐতিহ্যের বাস্তব নমুনা। যা নিজ ঐতিহ্যকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে শেখায়।

উপসংহার : মুসলিম হিসাবে আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য হ'ল, আল্লাহ্র দেওয়া এই বারোটি মাস সম্পর্কে যত্নশীল হওয়া। নিজেদের বক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবনসহ রাষ্ট্রীয় জীবনে এর যথাসাধ্য প্রয়োগ করা। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।

[লেখক : ছাত্র, ছানাবিয়াহ ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

৩. *মুসনাদে আহমদ হা/৯৫৫৬; বুখারী হা/১৯০৯; মুসলিম হা/১০৮৯।*
৪. *মুশকিলুল আছার লিত তাহাবী হা/৯৯৮।*

অনুবাদ গল্প

পাপ পুণ্য

অনুবাদ (ফার্সী থেকে) : আব্দুর রঊফ

অনেক দিন আগের কথা। প্রাচীনকালে এক বৃদ্ধ জ্ঞানী মুসলমান বুখারা শহরে বসবাস করতো। তাকে খাজা বুখারী বলা হত। একদিন খাজা তার ধন সম্পদ হিসাব করে দেখল তার হজ্জ ফরজ হয়ে গেছে। অতঃপর সে হজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে হজ্জ কাফেলার সাথে মক্কার পথে রওনা হয়।

খাজার ভ্রমণ সামগ্রী কাফেলার অন্য সকলের থেকে বেশী ছিল। খাজা বুঝতে পেরেছিল সে অন্যদের থেকে বেশী ধনী। তার দেখাশোনার জন্য কয়েকজন কর্মচারী ছিল। একশ'রও বেশী উট জিনিসপত্র বহন করছিল। অন্যদের উট, পালকি ও হাওদার চেয়ে খাজা বুখারীর সবকিছু ভাল ছিল। কর্মচারী ও উটের রশি ধরে যারা পথ চলছিল তারা সকলেই খাজাকে সম্মান করছিল। প্রথমতঃ এইজন্য যে, খাজা জ্ঞানী ও খ্যাতিমান ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ সকলের জন্য অনেক টাকা-পয়সা খরচ করছিল। যেখানেই তাবু স্থাপন করছিল সেখানেই নিজের খাবার টেবিলে কাফেলার সকল কর্মচারীদের রাতের ও সকালের খাবার দিচ্ছিল। এসব দেখে খাজা যে সম্মানীয় সেটা সকলেই বুঝেছিল। ঐ কাফেলায় কয়েকজন কম খরচে হজ্জে যাচ্ছিল। দরবেশের মত অল্পে সন্তুষ্ট ছিল এবং তারা ও তাদের কর্মচারীরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

সে সময়ে আরবের শুষ্ক বা ঘাসযুক্ত সমভূমি পাড়ি দেওয়ার জন্য উট ছাড়া কোন যানবহন ছিল না। হজ্জ সফর এক বছরের দীর্ঘ পথ ছিল। এই দরবেশ হজ্জযাত্রীরা যখন হেজাজের কাছাকাছি পৌছালো তখন দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে, অর্থ সংকটে ও অল্প খাওয়ার দরুণ তাদের শারীরিক সক্ষমতা অবশিষ্ট থাকলো না। এভাবেই একদিন হাজীগণ আরাফাতের মাঠে পৌছায়। বাতাস খুব গরম ছিল। দরবেশ হাজীগণের মধ্যে একজন যে খাজা বুখারীর টাকা-পয়সা বেশী সেটা দেখেছিল। সে কষ্ট সহ্য করতে করতে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। পায়ে হেঁটে এতদূর আসার ফলে তার আর হাঁটার শক্তি ছিল না, তৃষ্ণায় ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, বুক ধড়ফড় করছিল। কাতর হৃদয়ে সে খাজা বুখারীর কাছে এসে বলল : 'আমরা একসাথে হজ্জে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি এত সম্পদ নিয়ে যাচ্ছেন আর আমরা কষ্ট করে আল্লাহর ঘরের কাছে যাচ্ছি। লক্ষ্য করেন আপনার আর আমাদের ছওয়াব কী সমান হবে?'

খাজা উত্তর দিলেন : 'না, আমি সেটা দেখতে চাই না যে, আল্লাহর কাছে আমাদের ছওয়াব সমান হোক। যদি সেটা চিন্তা করতাম তাহলে এই গরমে এতদূর কষ্ট করে আসতাম না।'

দরবেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো : 'কেন? তাহলে নিজেকে আমাদের থেকে উত্তম মনে করেন ?'

খাজা বললেন : 'হ্যাঁ, কারণ আমি আল্লাহর আদেশ ও কোরআন অনুযায়ী আমল করি আর তুমি আদেশের বিপরীত আচরণ করছো। আমাকে হজ্জের আদেশ দেওয়া হয়েছে আর তোমাকে দেওয়া হয় নি। আমি অনুগত্য করছি আর তুমি আনুগত্য করছো না।'

দরবেশ বললো : 'আজব কথা শুনছি ?

খাজা বললেন : 'আসলে ঠিক কথাই শুনছো। হজ্জ সফর ছালাত নয় যে ধনী-গরীব সবার জন্যই ফরয হবে। হজ্জ সফরের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা শর্ত। আমার পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল বিধায় আমার উপর ফরয ছিল। তোমার পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল না তাই এই কষ্ট করে ছওয়াব পাবেনা।'

দরবেশ বললেন : 'এখন তাহলে আমাকে সাহায্য না করে কথা দিয়ে যখম করবেন?'

খাজা বললেন : 'না এটা যখম করা নয়, এটাই সত্য। আমি তোমাকে তোমার দেশে ফেরত পাঠাতে টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ধর্মের আদেশ তা-ই, যেটা বললাম। প্রত্যেক কাজের শর্ত আছে এবং প্রত্যেক আদেশ ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হয়েছে। ইসলামে জিহাদ ফরজ, কিন্তু অসুস্থ ও মহিলাদের জন্য ফরজ নয়। ছিয়াম ফরজ, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ফরজ নয়। দান করা ছওয়াবের কাজ, কিন্তু যদি এতে নিজের জীবন সংকটে পড়ে তাহলে গুনাহ হবে। মৃত জীব-জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম কিন্তু কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় মুমূর্ষ হলে সে গোশত ছাড়া আর কোন গোশত না থাকলে হারাম নয়। পিতা-মাতার আনুগত্য করা প্রতিটি সন্তানের জন্য কর্তব্য, কিন্তু হারাম ও গুনাহের কাজে তাদের আনুগত্য হারাম। প্রত্যেক আদেশ নির্দিষ্ট জায়গার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য সকল অবস্থার কর্তব্য জানানো হয়েছে।'

দরবেশ বললো : ঠিকই বলেছেন। তাহলে এখন আমি কী করবো ?

খাজা বললো : 'এখন আমি তোমাকে তোমার দেশে পাঠাবো কিন্তু এরপরে ইসলামের হুকুম সেভাবেই আমল করো, যেভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে। নিজের বুদ্ধি ও খেয়াল খুশিমত নয়। আমরা কিছু আদেশ গ্রহণ করবো আর কিছু আদেশ নিজেদের খেয়াল খুশিমত পরিবর্তন করবো এটা ইসলাম নয়। পড়, জিজ্ঞাসা করো, মুখস্থ করো তারপর আমল করো। যাতে তোমার কাজে মাথা উঁচু হওয়ার জায়গায় লজ্জায় পড়তে না হয়।'

শিক্ষা : প্রতিটি ইবাদত আল্লাহ ও রাসূল (ছা:)-এর নির্দেশে ও দেখানো পদ্ধতিতে করলেই ছওয়াব পাওয়া যায়। নিজের খেয়াল খুশিমত আমল করে শত পরিশ্রম করে কোনই ফায়দা পাওয়া যাবে না।

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

জীবনের বাঁকে বাঁকে

মৃত্যু!

-ইঞ্জিনিয়ার তাসনীম আহসান, ঢাকা।

[লেখক রাজধানী ঢাকায় গত ৭ই জানুয়ারী ২০২১ ভোরে ফজরের সময় মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে দীর্ঘদিন তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। ফেসবুকে তাঁর এ্যাকাউন্টে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি করেছেন। নিম্নে তাঁর মৃত্যুপূর্ব মর্মস্পর্শী একটি লেখা উপস্থাপন করা হল-]

১.

ইদানীং মাঝে মাঝেই আমি চিন্তা করি; আমার মৃত্যুর দিনটা কেমন হবে; যেদিন আমি একটা জলজ্যান্ত মানুষ থেকে 'লাশে' পরিণত হব; কেমন হবে সেই দিনটা? আমার বাসার মাঝখানে ড্রয়িংরুমের মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে। আমি খুব ভাল বুঝতে পারি, লাশটা খুব সম্ভবতঃ সেখানেই রাখবেন সবাই। আচ্ছা, আমার নাকে তো একটা তুলাও গুঁজে দেওয়া হবে, তাই না? আমার দাদীর লাশে আমি দেখেছিলাম ওরা তুলা ঠেসে দিয়েছিল। আমার মণি চাচা পরম আদরে তাঁর মায়ের মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। অশ্রু সজল আমার চাচা বিড়বিড় করে শেষবারের মত মাকে কিছু বলছিলেন বোধহয়, আমি শুনতে পাই নি। আচ্ছা, আমার বেলায় কে হাত বুলিয়ে দেবেন?

আমার মনে মনে খুব ইচ্ছা আমি যেন ফজরের ওয়াক্তে আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারি। আধো আলো, আধো ছায়া। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। না থাক। প্রচণ্ড বৃষ্টি দরকার নেই। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হলেও চলবে। বিরামহীন হালকা আওয়াজে বৃষ্টির শব্দের সাথে মিলিয়ে ফজরের অসাধারণ আযান সেই অদ্ভুত সময়ে কানে ভেসে আসুক, আল্লাহ্‌র কাছে আবদার।

আচ্ছা, কতদিন বৃষ্টিতে ভিজি না জানেন? প্রায় ৩ বছর হতে চলল। সিঙ্গাপুরে যখন চিকিৎসার জন্য ছিলাম, তখন সেখানে ভীষণ বৃষ্টি পড়ত। কিন্তু সেই বৃষ্টিতে ভেজার সুযোগ ছিল না। কারণ সে সময় চিকিৎসার প্রয়োজনে আমার হাতে একটা সেন্ট্রাল লাইন করা ছিল যেটা হার্ট পর্যন্ত কানেক্টেড। শরীরের ঐ অংশটা আমার ভেজানো নিষেধ ছিল। আমি প্রায় টানা দেড় বছর গোসল করার সময়েও সে জায়গাটায় বিরামহীনভাবে পানি ঢালতে পারি নি। আমি বৃষ্টিতে ভেজার প্রবল নেশা নিয়ে সিঙ্গাপুরের কুকুর-বিড়াল বৃষ্টি দেখতাম। আমার স্ত্রী আমার মন খারাপ করা মুখ দেখে চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলতেন, 'আমরা যখন সুস্থ হয়ে যাব, তখন বাংলাদেশে ফিরে যেয়ে দু'জন মিলে ধুমসে বৃষ্টিতে ভিজব, কেমন?' আমিও বোকার মত তার কথা মেনে নিতাম। তাছাড়া 'সিঙ্গাপুরের বৃষ্টিটাও দেশের মত অত সুন্দর না, ভেবে মনকে বাঁধ মানানোর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

সেই আমার আর সুস্থ হওয়াও হল না। এখন পর্যন্ত বৃষ্টিতেও ভেজা হল না। বউ আমাকে এভাবে ধোঁকা দিল! হঠাৎ করে মেঘ করলে ব্যস্ত ঢাকা শহর যেমন কালো হয়ে যায়, তখন আমার মৃত্যুর পরিবেশটা হলে বেশ হয়। বৃষ্টি আমি বড় ভালোবাসি।

২.

আমার লাশটা গোসল দেওয়ার পর যখন মেঝেতে পাটির উপর রাখা হবে, প্রচণ্ড জাগতিক ব্যস্ততাও থাকবে নিশ্চয়ই। সবাইকে জানানো। মরা বাড়িতে ঘনিষ্ঠ-অঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন যেই আসুক, সবাইকে কিছুটা হাসিমুখে রিসিভও করতে হয়। আমার যারা ভাই আছেন তাঁদের ঘাড়ে নিশ্চয়ই এই দায়িত্বটা পড়বে। আমার অনেকগুলো ভাই। আমি জানি, আমি যেদিন চলে যাব, এরা কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আড়ালে আড়ালে কাঁদবেন। আবার কাঁদার ফাঁকে ফাঁকে সবাইকে একটু হলেও বসাবেন। গ্রীট করবেন। আত্মীয়রা একটু লাশটা দেখতে চাইবেন নিশ্চয়ই। শেষ দেখা। আমার ভাইরা কাফন খুলে দেখাবেন।

আমি কল্পনায় পরিস্কার দেখতে পাই, আমার বোন আর স্ত্রী গলাগলি ধরে সেদিন খুব কাঁদছেন। আমার বোনের কথা আপনাদের প্রায় কোন লেখাতেই বলা হয় নি। আমার বোনটা আমার চেয়ে ৬ বছরের ছোট। ওর জন্ম হওয়ার ১৫/২০ দিনের মাথাতেই আমার মাকে আবার অফিসে জয়েন করতে হয়। আমাদের তখন কঠিন জীবন সংগ্রাম। আমি তখন আমাদের পুরনো ঢাকার সেই দোতালার ভাড়া বাসায় কাজের লোক চায়না আপার আন্ডারে সারাদিন থাকি। খুবই নিরুত্তাপ দিন কাটে। ও হওয়ায় আমার বেশ ভাল সময় কাটার উপলক্ষ হয়।

কী সুন্দর একটা বাচ্চা! আমার বোনটা হওয়ার পর এত্ত টকটকে লাল ফর্সা ছিল যে সবাই ওর নাম দিয়েছিল জাপানী ডল। আর মাথাভর্তি কী চুল! ঘন চুল। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। চায়না আপার কাছ থেকে টাম্বলার কেড়ে নিয়ে ওকে খাওয়াতাম। ও যখন ঘুমিয়ে থাকত, ওর পাশে শুয়ে থাকতাম। শুধু অপেক্ষা করতাম, ও কখন ঘুম থেকে উঠবে! কিন্তু ও বেয়াড়ার মত প্রায় সারাদিনই ঘুমাত। ওর নীরবতা আমার অসহ্য মনে হত। অস্থির হয়ে যেতাম। আমি সে সময়ে আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারগুলো সঙ্গত কারণেই বুঝতাম না কিন্তু সারাক্ষণ মনে হত ওকে জড়িয়ে ধরে থাকি। আমার বোন সেই ছোট্ট নিলোপলার চেয়ে সুন্দর কিছু আমি তখন পর্যন্ত আর দেখিনি। আসলে এখন পর্যন্তও দেখিনি। আমার কোলে করে ওকে বড় করেছি। কত ভাল যে আমি ওকে বাসি ও তার কিছুই তখন বুঝত না। এখনো বোঝে বলে মনে হয় না।

আমার সেই বোনটা আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। জানি না, আমি যেদিন মারা যাব তার আগেই ওর বিয়ে হয়ে যাবে কিনা। আমি কি দেখে যেতে পারব ও নতুন জীবন শুরু

করেছে? অবশ্য আমি দূরতম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না আমার নিলোপলার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমি 'নিলোপলা' বলে ডাকব আর ওকে ঘরে দেখতে পাব না, কেউ 'ভাইয়া' বলে ডাক শুনবে না, এই পরিস্থিতি কল্পনা করতেও আমার চোখে পানি চলে আসে। আমার নিলোপলার বিয়ে হয়ে যাবে, ভাবা যায় না। আমি জানি আমার লাশ সবাই যখন মুখ খুলে খুলে দেখবে, আমার বোনটা খুব কাঁদবে। খুবই কাঁদবে। জানেন? ওকে আমি ভয়ংকর ধরণের ভালবাসি।

আমার মৃত্যুর দিন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে যাবেন। মেয়েটা খুব বেশি শারীরিক ধকল নিতে পারে না। সেদিন পারার প্রশ্নই আসে না। মনের গভীর দুঃখ থেকে যেই কান্না আসে সেটা আমার স্ত্রীর ব্রেনের জন্য খুব বেশী ক্ষতিকারক হবে। কাঁদতে কাঁদতে সে হুঁশে নাও থাকতে পারে। এই মানুষটা যে কী ভীষণ বিশ্বাস করে, এই ক্যান্সার আমার কিছু করতে পারবে না, আমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাব! সে আমাকে নিয়ে কতশত ছেলেমানুষী পরিকল্পনা যে করে ভাবতে পারবেন না। তার খুব স্বপ্ন একটা ফাউন্ডেশন করবে। যেটা টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না, এমন মানুষদের নিয়ে কাজ করবে। সেটার একটা বিজনেস উইংও থাকবে।

থাইল্যান্ড/চায়না থেকে সেই উইং প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করবে। একটা বড় ই-কমার্স জাতীয় কিছু হবে। আমি আবার সেই পুরনো দিনের মত সফটওয়্যারটা বানিয়ে দিব। ফাউন্ডেশনের নাম হবে 'আশাবরী'। ভাবুন তো, এত ছেলেমানুষও কেউ হয়।

সেই বৃষ্টি ভেজা দিনে আমার লাশ দেখে তাঁর এই স্বপ্নগুলো ভেঙে না যায়, এটাই আমার ইচ্ছা। সে বাঁচুক। আশাবরী ফাউন্ডেশন হোক। কোন সহৃদয়বান পুরুষ এসে তার হাত ধরুক। তাঁকে বলুক, 'এই তো, আমি পাশে আছি, কে বলল তুমি একা?'। সে ভাল থাকুক। তার স্বপ্ন পূরণ হোক। তার কোলজুড়ে আসুক নতুন দিনের নতুন সন্তান। আমার সাথে সুখ হল না তো কি হয়েছে? সে ভাল থাকুক। সুখে থাকুক। আমার সাথে বিয়ে হয়ে তার জীবনের শুরুটা বড় কষ্টে কাটল। বাকীটা তার সুখে কাটুক। সর্বোচ্চ আনন্দে কাটুক। আল্লাহ যেন তাকে সব দেন।

আমার মৃত্যুর দিন আমাকে শেষ দেখা দেখতে এসে বিব্রত হবেন আসলে আমার হাতে গোনা কিছু বন্ধু-বান্ধব। এরা এসে বুঝতেও পারবেন না, কোথায় বসবেন, কোথায় দাঁড়াবেন? এদের তো কেউ আত্মীয়দের মত আন্তরিকতার সাথে ডেকে ঘরে বসাবেন না। এরা কাউকে লাশ দেখতে চাই বলতেও পারবেন না। আবার লাশ না দেখে বাড়িও ফিরতে পারবেন না। খাটিয়া দিয়ে যখন গ্যারেজে নামিয়ে নেওয়া হবে, তখনই একমাত্র সুযোগ। আমার যারা আসলেই ঘনিষ্ঠ ধরণের বন্ধু। এরা একটু ইন্ট্রোভার্ট প্রকৃতির। এরা হয়তো নিঃশব্দে আমার লাশের খাঁটিয়াটা ঘাড়ে তুলে নেবেন, কিন্তু কাউকে মুখ ফুঁটে বলতে পারবেননা, 'একটু দেখি তো ভাই'।

আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমার মৃত্যুর দিন আমাকে দেখতে আসতে পারবেন না। একটা সময় ছিল, আমরা বন্ধু-বান্ধবরা যখন এলাকায় সেলিমের চায়ের দোকানে এক সাথে বসতাম, আর কেউ বসার জায়গা পেত না। ১৫/২০ জন মিলে হৈ হৈ। জীবনের প্রয়োজনে খুব আশ্চর্য শোনালেও সত্য, এলাকায় আর এখন কেউই থাকেনা। সবাই বিদেশে সেটল করেছেন বা করার প্রসেসে আছেন। একদম সবাই। এলাকায় পড়ে ছিলাম শুধু আমি একা। সুতরাং আমার সাথে তাঁদের কারোরই শেষ দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ভাবতে কেমন যেন লাগে। যাদের সাথে জীবনের এত সময় কাটিয়েছি; একদিন বাদে পরের দিন দেখা না হলে মনে হত; কতকাল দেখা হয়নি; তাদের সাথে শেষ দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটাও হিসাব করতে হচ্ছে।

লোকে বলে, পৃথিবীতে নাকি সবচেয়ে ভারী বস্তু হল পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ। সেদিন আমার বাবাকে এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, ভাবতেই খারাপ লাগছে। আমার বাবার পায়ে প্রচণ্ড ব্যাথা। উনি ভালোভাবে হাঁটতে পারেন না। আর্থ্রাইটিসের কারণে। আমার চিকিৎসা চলাকালীন হার্ট অ্যাটাকও করেছিলেন। সেই খবর তারা আমার কাছে তখন গোপন করেছিলেন। তার রিংও পরানো আছে। কিন্তু কি আর করা, একমাত্র ছেলে যেহেতু তাঁদের দেখভাল করতে অক্ষম ছিল, তাই তাঁর এই খোঁড়া পা নিয়েই জীবিকার তাগিদে প্রতিদিন ভোর বেলা অফিস করতে বের হয়ে যেতে হয়।

আমার পিতা আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন বলতেন, ২০২১ সালের পর আর কাজ করব না। কমপ্লিট রিটায়ার। সারাদিন বাসায় শুয়ে থাকব।

আমিও তাগিদ দিয়ে বলতাম, তোমাকে ইনশাআল্লাহ আর কিছু করতেও হবে না, আব্বা। আমরা সব সামলাতে পারব। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া আছে। আমি চাকরি করব, আউটসোর্সিং করব (সুস্থ থাকার সময় করতাম কিন্তু), ব্যবসা করব, তমা (আমার স্ত্রী) কিছু একটা করবে। ইনশাআল্লাহ সব হয়ে যাবে।

কি কথা ছিল, আর কি হল বলেন তো? আমার চিকিৎসার জন্য সেই ফ্ল্যাটটাও বেঁচে দিতে হল। আর আমি তো আমিই। একটা বিকলাঙ্গ বোঝা হয়ে বেঁচে ছিলাম, যতদিন ছিলাম। আমার বাবার সাধের ২০২১ সালের রিটায়ারমেন্টটা আর আসল না। আল্লাহ্‌র ফায়ছালা। যা আছে কপালে আলহামদুলিল্লাহ।

খোঁড়া পায়ে বাবাকে এখনও অফিসে দৌড়াতে হয়, বাজার করতে হয়। মাঝে মাঝেই হাঁটতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যেতে হয়। আমার বাবা অবশ্য এসব কথাবার্তা একদমই আমলে নেন না। তার মত এরকম আবেগী মানুষ আমি আর দেখি নি। আমার ভিতরে যতটুকু আবেগ, পুরোটাই আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া। আমার ও নিলোপলার প্রতি তার আবেগের তীব্রতা এত বেশী সেটা বোঝানো কঠিন। আমাদেরকে শুধু চোখের দেখা দেখতে পারলেও তার চোখ চকচক করে। তার সামনে বসে থাকলেও কতবার যে আমাদের নাম ধরে ডাকেন! কতবার যে গায়ে হাত বুলিয়ে দেন! আমি জানি না আমার নিঃস্পন্দ লাশের গায়ে যখন তিনি হাত বুলাবেন, তখন তার কেমন লাগবে!! আমি জানি না। সত্যিই জানি না।

৩.

আমার খুব ইচ্ছা আমার কবর আমার দাদা বাড়ির কবরস্থানে দাদার পাশেই দেওয়া হোক। দাদাকে যেদিন কবর দেওয়া হয় সে সময় আমার বয়স ১০/১১। আমার মনে আছে আমি জীবনে প্রথমবারের মত কবর খোঁড়া দেখেছি। আমার দাদার লিভার ক্যান্সার হয়েছিল। ঢাকা থেকে লাশ বাড়িতে আনতে আনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির কবরস্থানে তিন-চার জন লোক কবর খোঁড়ার আয়োজনে। হ্যাজাক লাইট জ্বালানো হয়েছে। বেশ দ্রুত কাজটা এগিয়ে যাচ্ছে। আমার দেখতে বেশ লাগছে। কবর খুঁড়তে খুঁড়তে যখন গভীর হয়ে গেল, তখন আমার কেমন যেন অস্বস্তি লেগে উঠল। এত গভীর করছে কেন? এত নীচে দাদাকে ফেলে দিবে? এটা কেমন কথা? ফেলে দিয়ে আবার চাপা দিয়ে দিবে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্তও কবর খোঁড়াটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হলেও কবরের গভীরতা দেখে আর ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছিল না। কেমন ভয়ংকর! একটা কালো ধরণের গর্ত। এখানে মানুষকে ফেলে দেওয়া হয়, তারপর চাপা দিয়ে চুপচাপ চলে আসা হয়। দাদাকে আর দুনিয়াতে কোনদিনও যে দেখা যাবে না, সেই সময় আমার প্রথম মনে হয়েছিল।

আমার লাশের জন্যও সেই রকমই একটা গর্ত খোঁড়া হবে নিশ্চয়ই। তারপর ফেলে দেওয়া হবে, তারপর চাপা দিয়ে চুপচাপ চলে আসা হবে। এই দুনিয়ায় আর কোনদিন দেখা হবে না। আমার এই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে নিশ্চয়ই কেউ স্ট্যাটাস দিয়ে দেবেন যে আমি আর নেই। আমার যারা আধা-পরিচিত, পরিচিত বা অপরিচিত মানুষ আছেন, তারা জেনে যাবেন যে তাসনীম আহসান আর বেঁচে নেই। মামলা ঢিসমিস। ভার্সিটির যেসব বন্ধুদের সাথে আর দেখা হয় নি, বা যোগাযোগ থাকেনি তারা মুখ দিয়ে একটু চুকচুক করবেন। আমার মৃত্যুর খবর দেওয়া স্ট্যাটাসে ইন্না-লিল্লাহ লিখবেন। এইতো।

৪.

আমি এখন মোটামুটি সম্পূর্ণই বিছানায় পড়ে গেছি। হাত-পা কাজ করতে চায় না। প্রতি মাসেই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। বিচ্ছিরি সব হাই ডোজ কেমোথেরাপি নিতে হয়। চোখেও ভাল দেখি না। বইপত্র পড়তে কষ্ট হয়। চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

তাই আমার সময় কাটানোর জন্য আমি প্রায়ই একটা কাজ করি। আমার অসুস্থতা নিয়ে লেখা পুরনো পোস্টগুলো পড়ি। ঐ সময়টাকে মনে করি। আপনাদের কমেন্টের অ্যাপ্রিসিয়েশনগুলো দেখি। আপনাদের দো'আগুলো দেখি। প্রায়ই চোখ ভিজে যায়। দুনিয়ার মায়ায় পড়ে যাই। আপনজনদের ছেড়ে মরে যেতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে, সবাইকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে বাঁচি।

আমার মাকে জড়িয়ে ধরে বলি, আমি ভাল হয়ে গেছি মা। আমার রোগ সেরে গেছে। আমার স্ত্রীকে বলি চল, আমরা বাঁচি। ভরপুর করে। আল্লাহ পৃথিবীতে যেই নে'মত দিয়েছেন, তা উপভোগ করি। লেটস মেক এ ফ্যামিলি। লেটস স্টার্ট ফ্রেশ! বাবাকে বলি, আব্বা, তোমাকে আর ক্লিনিকে যেতে হবে না। আর সাত সকালে অফিসেও যেতে হবে না। আমি আছি না? নিলোপলার বিয়ের দিন সুস্থভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে ইচ্ছা করে। হয়তো ওর দামী মেকআপ নষ্ট হয়ে যাবে। সে হোক।

খুব ইচ্ছা করে, জানেন? খুব। কিন্তু ইচ্ছা করলেই সমস্ত হবে, এমন না। সেটা যরূরী নয়। যে যা পায়, সেটাই তার জন্য শোভন ও সুন্দর। আল্লাহ তা'আলা কাউকে ঠকান না। আল্লাহ তা'আলা আমার মনের অস্থিরতা দূর করুন। সমস্ত গুণাহ মাফ করে দিন। শহীদী মৃত্যু দান করুন। মৃত্যুর মুহূর্তে যেন আযরাঈল অভিবাদন দিয়ে আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে যান। আসমানের বাশিন্দারা যেন আমার রূহকে হাসতে হাসতে স্বাগত জানান।

আল্লাহ কবুল করুক। আপনারা আমাকে দো'আয় মনে রাখবেন।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ২০২০-২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০-১১ই ডিসেম্বর'২০ ও ৭-৮ই জানুয়ারী'২১ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের মিলনায়তনে দুই দফায় ২দিন ব্যাপী যেলা দ্বায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ম দফায় রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের ২১টি যেলা থেকে ১১০ জন এবং ২য় দফায় ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ২৩টি যেলা থেকে ১০৫ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারুন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

যেলা সংবাদ

জোতমাধব, বিরামপুর, দিনাজপুর ১১ই নভেম্বর'২০ বুধবার : অদ্য বাদ জোতমাধব আমগাছি ইদগাহ মাঠ, বিরামপুর, দিনাজপুর জোতমাধব আমগাছি 'যুবসংঘ' শাখার উদ্যোগে এক 'তাবলীগী ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শাখা আন্দোলনের সভাপতি মজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবু তাহের, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক শোয়াইব। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আহসান হাবীব।

বিশ্বনাথপুর কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ২৬শে নভেম্বর'২০ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মাওলানা ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছালেহ সুলতান। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক।

ডাক বাংলা পাড়া, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর ২৭ শে নভেম্বর'২০ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ডাক বাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক 'মাসিক তাবলীগী ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ -এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসেন।

জামদই, মহাদেবপুর, নওগাঁ ৩০শে নভেম্বর'২০ সোমবার : অদ্য বাদ ফজর জামদই কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মহাদেবপুর, নওগাঁ 'যুবসংঘ'-এর জামদই এলাকা উদ্যোগে এক এলাকা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাদ ও যেলার 'সোনামণি' পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেন।

আরামনগর, জয়পুরহাট ৪ই ডিসেম্বর'২০ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাদ-এর সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুন'ইম।

বাংলাহিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর ২১শে ডিসেম্বর'২০ সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব বাংলাহিলি হিলফুল ফুযূল মাদরাসায় আক্কেলপুর উপযেলা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক উপযেলা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামসুল আলম-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক তারাজুল ও প্রচার সম্পাদক ফয়ছাল মুরাদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ।

মনিপুর, গাযীপুর ২৭ শে ডিসেম্বর রবিবার' ২০ : অদ্য বাদ মাগরিব মনিপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হাতেম বিন পারভেজ ও সদ্য সাবেক সভাপতি শরীফুল ইসলাম।

তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৩০শে ডিসেম্বর'২০ বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টা হতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তাহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে তাহেরপুর দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ মসজিদে এক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী (পূর্ব) 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি বুলবুল ইসলাম, ডা. মনছুর আলী, আবুল কালাম আযাদসহ স্থানীয় দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন মোঃ মীযানুর রহমান।

আরামনগর, জয়পুরহাট ১লা জানুয়ারী শুক্রবার'২১ : অদ্য বাদ জুম'আ আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুস ছবূরের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুন'ইম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাদ ও যেলা সোনামণি পরিচালক ফিরোজ হোসেন প্রমুখ।

সাভার, ঢাকা ১লা জানুয়ারী'২১ শুক্রবার : অদ্য বাদ সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত জিরানী পুকুরপাড় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আরাফাত-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট ৪ঠা জানুয়ারী'২১ সোমবার : অদ্য বাদ আছর গভরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আক্কেলপুর উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সোনামণি পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-র সভাপতি মাওলানা আব্দুস ছবুর, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক প্রমুখ।

মামুদপুর, জয়পুরহাট ০৫ জানুয়ারী'২১ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর মামুদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মামুদপুর শাখা উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ সুলতান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহ আলম ও যেলার সোনামণি পরিচালক ফিরোজ হোসেন।

মোহনপুর, রাজশাহী ৬ই জানুয়ারী'২১ বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মোহনপুর আহলেহাদীছ মসজিদে এক মাসিক তা'লীম বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কতটি যেলায় ই-পাসপোর্ট চালু হয়েছে? উত্তর : ৬৪টি যেলায়।
২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের নতুন ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : মুহাম্মাদ ফরিদুল হক খান।
৩. প্রশ্ন : কত তারিখে দেশে প্রথমবারের মত হেলথ কার্ড চালু হয়েছে?
উত্তর : ২২ নভেম্বর ২০২০।
৪. প্রশ্ন : দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দরের নাম কী?
উত্তর : মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর।
৫. প্রশ্ন : দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হবে কোথায়?
উত্তর : মহেশখালী, কক্সবাজার।
৬. প্রশ্ন : দেশে নতুন ইপিজেড নির্মাণ করা হবে কোথায়?
উত্তর : রংপুর, যশোর ও পটুয়াখালী।
৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি) কত? উত্তর : ১,১২৫ জন।
৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রত্যাশিত গড় আয়ু কত?
উত্তর : ৭২.৬ বছর।
৯. প্রশ্ন : দেশের চরম দারিদ্রের হার কত?
উত্তর : ১০.৫%
১০. প্রশ্ন : ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : তৃতীয়।
১১. প্রশ্ন : সবজি উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : তৃতীয়।
১২. প্রশ্ন : আম উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : সপ্তম।
১৩. প্রশ্ন : আলু ও পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : অষ্টম।
১৪. প্রশ্ন : বিশ্বের কতটি দেশে বাংলাদেশর ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে? উত্তর : ১৪৮টি।
১৫. প্রশ্ন : বিশ্বের কতটি দেশে বাংলাদেশের ভেষজ ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে? উত্তর : ৯টি।
১৬. প্রশ্ন : দেশ জুড়ে স্থাপিত ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা কতটি? উত্তর : ৪৩৬টি।
১৭. প্রশ্ন : ২০২০ সালের এশিয়া লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন কে?
উত্তর : কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতার (বাংলাদেশ)
১৮. প্রশ্ন : ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার লাভ করেন কে? উত্তর : সাদাত রহমান (বাংলাদেশ)
১৯. প্রশ্ন : ২০২০ সালের বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : অষ্টম
২০. প্রশ্ন : বিশ্বে জাহাজ রিসাইকেলে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : বাংলাদেশ।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : কোন দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটির মাইলফলক অতিক্রম করেছে? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
২. প্রশ্ন : কোন দেশে ১৮৭ বছর পর মসজিদ উদ্বোধন হয়েছে? উত্তর : গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে।
৩. প্রশ্ন : কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেনাপ্রধান, গোয়েন্দাপ্রধান ও পররাষ্ট্র প্রধানকে বরখাস্ত করেছে?
উত্তর : ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ।
৪. প্রশ্ন : গোল্ডেন ভিসার মেয়াদ ও ক্যাটাগরি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে কোন দেশ?
উত্তর : সংযুক্ত আরব আমিরাত।
৫. প্রশ্ন : বাহরাইনের মৃত্যুবরণকারী প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : শেখ খলিফা বিন সালমান আল-খলিফা।
৬. প্রশ্ন : ইরাক ও সৌদিআরব স্থলসীমান্ত কত বছর পর খুলে দেওয়া হয়? উত্তর : ৩০ বছর।
৭. প্রশ্ন : বাহরাইনের দ্বিতীয় ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম ক?
উত্তর : সালমান বিন হামাদ আল খলিফা।
৮. প্রশ্ন : ২০২০ সালের বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যায় শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।
৯. প্রশ্ন : ২০২০ সালের বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : ভারত।
১০. প্রশ্ন : বিশ্বের সেরা কর্মীবান্ধব কোম্পানি নাম কি?
উত্তর : স্যামসাং।
১১. প্রশ্ন : বিশ্বের শীর্ষ ব্যয়বহুল শহর কি কি?
উত্তর : জুরিখ, সুইজারল্যান্ড; প্যারিস, ফ্রান্স, হংকং ও চীন।
১২. প্রশ্ন : বিশ্বের শীর্ষ সস্তা কোনটি?
উত্তর : দামাস্কাস, সিরিয়া।
১৩. প্রশ্ন : বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশ কোনটি?
উত্তর : কাতার (১,৩২,৮৮৬ মার্কিন ডলার)।
১৪. প্রশ্ন : সাম্প্রতিক কোন দেশের পুলিশ ইউনিফর্মে হিজাব যুক্ত করেছে? উত্তর : নিউজিল্যান্ডে।
১৫. প্রশ্ন : মিয়ানমারের নির্বাচনে কতজন মুসলিম বিজয়ী হয়েছে?
উত্তর : দুইজন। সেতু মায়াং ও ডো উয়িন মায়া মায়া।
১৬. প্রশ্ন : বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদের নাম কি?
উত্তর : আলজেরিয়া গ্রান্ড মস্ক।
১৭. প্রশ্ন : আলেমদের নিজস্ব টিভি চ্যানেল চালু হতে যাচ্ছে কোন দেশে? উত্তর : উগান্ডা।
১৮. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম কোন দেশ কুরআনিক ভিলেজ বানাতে যাচ্ছে? উত্তর : মালয়েশিয়া।
১৯. প্রশ্ন : নবীজির জীবনীভিত্তিক জাদুঘর কোথায় তৈরী হবে? উত্তর : জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।
২০. প্রশ্ন : মহাকাশে বিশ্বের প্রথম 6G স্যাটেলাইট চালু করে কোন দেশ। উত্তর: চীন।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : হযরত আল-ইয়াসা‘ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কোন কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : সূরা আন‘আম ও সূরা ছোয়াদে।
২. প্রশ্ন : হযরত আল-ইয়াসা‘ কোন নবী বংশের ছিলেন?
উত্তর : ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব-এর বংশধর।
৩. প্রশ্ন : তিনি কোন অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন?
উত্তর : ফিলিস্তীন অঞ্চলে।
৪. প্রশ্ন : হযরত যুলকিফ্ল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কোন কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদে।
৫. প্রশ্ন : তিনি কোন নবীর স্থলাভিষিক্ত হন?
উত্তর : হযরত আল-ইয়াসা‘-এর।
৬. প্রশ্ন : যুলকিফ্ল (আঃ)-এর মধ্যে কোন ৩টি গুণ ছিল?
উত্তর : (১) সর্বদা ছিয়াম পালনকারী (২) আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণকারী এবং (৩) তিনি কোন অবস্থায় রাগান্বিত হন না।
৭. প্রশ্ন : ‘যুলকিফ্ল’ অর্থ কি? উত্তর : দায়িত্ব বহনকারী।
৮. প্রশ্ন : হযরত যুলকিফ্ল কখন ঘুমাতেন?
উত্তর : কেবলমাত্র দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন।
৯. প্রশ্ন : ইবলীস কখন এই নবীকে পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করেছিল? উত্তর : দুপুর বেলা।
১০. প্রশ্ন : কোনরূপ ধারণ করে যুলকিফ্ল নবীর নিকট গিয়েছিল?
উত্তর : একজন বৃদ্ধ মযলূমের রূপে।
১১. প্রশ্ন : ইবলীস প্রথম দিন কি করেছিল?
উত্তর : তার উপর কৃত যুলুমের দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা করে যুলকিফল (আঃ)-এর দুপুরে নিদ্রার সময়টা পার করে দিয়েছিল।
১২. প্রশ্ন : ২য় দিন ইবলীস কি করেছিল?
উত্তর : সে ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের পানি ফেলে বিরাট কৈফিয়তের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করল। সে বলল, হুযুর! আমার বিবাদী খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক। আপনাকে আদালতে বসতে দেখলেই সে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে কথা দেয়। কিন্তু আপনি চলে গেলেই সে তা প্রত্যাহার করে নেয়’।
১৩. প্রশ্ন : তৃতীয় দিন যুল-কিফ্ল (আঃ) কিভাবে ইবলীসকে চিনলেন?
উত্তর : তৃতীয় দিনও বৃদ্ধ সেজে আসলে বাড়ীর লোকেরা তাকে বাধা দিল। তখন সে সবার অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যুলকিফলের ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলেন, সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে অথচ ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি বুঝে ফেললেন, এটা শয়তান।
১৪. প্রশ্ন : যাকারিয়া (আঃ) ও ইয়াহইয়া (আঃ) পরস্পর কি সম্পর্ক ছিল?
উত্তর : পিতা-পুত্র।
১৫. প্রশ্ন : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ) কোথায় বসবাস করতেন?
উত্তর : বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে।
১৬. প্রশ্ন : ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সাথে ঈসা (আঃ)-এর কি সম্পর্ক ছিল?
উত্তর : নবী ঈসার (আঃ)-এর আপন খালাত ভাই ও বয়সে ছয় মাসের বড়।
১৭. প্রশ্ন : কোন নবী অতি বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে একমাত্র পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন?
১৮. উত্তর : যাকারিয়া (আঃ)।
১৯. প্রশ্ন : কোন নবীর নাম স্বয়ং আল্লাহ রেখেছেন?
উত্তর : ইয়াহইয়া নবীর নাম। যার নাম ইতিপূর্বে রাখা হয় নি।
২০. প্রশ্ন : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৪টি সূরায় ২২টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

যে অন্তরে তা গেঁথে যাবে তাতে একটি করে কালো দাগ পড়বে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দুই অন্তর দু’ধরণের হয়ে যায়। একটি হয়ে যায় মসৃণ সাদা পাথরের ন্যায়; যে অন্তর আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফেৎনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর অপরটি হয়ে যায় কলসির উল্টা পিঠের ন্যায় ধুসর কালো, যে অন্তর ভালোকে ভালো বলে জানবে না; আবার খারাপকেও খারাপ মনে করবে না, কেবল প্রবৃত্তির দাসত্ব ছাড়া। অর্থাৎ ভালো-মন্দ পার্থক্যের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে প্রবৃত্তির অনুসরণে সে যা ইচ্ছা তাই করবে *(মুসলিম হা/১৪৪)*।

সুতরাং যদি নিয়মিত বিবেক ও হৃদয়ের এই প্রতিরোধ শক্তি জাগ্রত রাখতে পারি, তবে একসময় তা আল্লাহর রহমতে হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে যাবে। আর এমন হৃদয়ে সহজে কোন পাপ-পঙ্কিলতা প্রবেশ করতে পারবে না। যেমনটি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অতএব মনকে নিয়ন্ত্রণ করার এই কৌশল আমাদেরকে অবশ্যই আয়ত্ব করতে হবে, যদি আমরা পাপমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হতে চাই। সবশেষে যাবতীয় প্রতিরোধ ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনক্রমে পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করতে হবে এবং কোন একটি ভালো কাজ দ্বারা সেটির কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। যেন তার প্রভাব কোনভাবেই অন্তরে বিস্তার লাভ করতে না পারে *(তিরমিযী হা/১৮৯৭)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল পাঠক ও পাঠিকা ভাই-বোনকে চক্ষু হেফাযতের মত এই গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক প্রতিরোধ বুহ্যটি ধারণ করা ও আয়ত্ব করার তাওফীক দান করুন এবং ছোট-বড় যাবতীয় পাপকর্ম থেকে নিজেকে হেফাযত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২১

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার
  ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার
  ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার
  ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (৫টি)
  ২,০০০/-

নির্বাচিত গ্রন্থ

তাফসীরুল কুরআন

(২৬ থেকে ২৮ তম পারা)

লেখক : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- পরীক্ষার ফি
  ১০০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ
  তাবলীগী ইজতেমা ২০২১-এর ২য় দিন
  সকাল ০৮থেকে ১০ টা
- প্রশ্নপদ্ধতি
  এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান
  কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
  তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন এ্যাপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার

এ্যাপে যা সংযুক্ত করা হয়েছে

- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ
- প্রতি মাসের আত-তাহরীক (পুরাতন সংখ্যা সহ)
- বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল (৩০০০+)
- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অন্যান্য আলেমদের বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য (১৫০০+)
- তাবলীগী ইজতেমা, জুম'আর খুৎবা ও ইসলামী সম্মেলনের বক্তব্য সমূহ
- আত-তাহরীক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠানসমূহ
- আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর জাগরণীসমূহ

Hadeeth Foundation

GET IT ON Google Play

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২১ মূল্য : ২৫ টাকা

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

৩১তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২১

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

২৫ ও ২৬ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭৯১-৫৭৮০৫৭

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর প্রয়োজনীয় ৪টি প্রকাশনা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ই-মেইল : ahlehadeethjuboshongho@gmail.com, ওয়েব : www.juboshongho.org